রাহুল সাংকৃত্যায়ন

রামরাজ্য ও মার্কসবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামরাজ্য ও মার্কসবাদ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

RAMRAJYA O MARXBAD

Bengali translation of Rahula Sankrityayan's Hindi Original

Ramrajya Aur Marxbad

অনুবাদ

জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়
মলয় চট্টোপাধ্যায়

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ১৯৯৩ ॥ আশ্বিন, ১৪০০

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

শুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রিন্টার্স
১৮৯ অরবিন্দ সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ

সন্দীপন ভট্টাচার্য

ISBN 81-85696-13-6

দাম ১৮·০০ টাকা
(Rs. 18·00)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন / ৫
দুটি কথা / ৯
ঋষি করপাত্রীর ঋষিত্ব / ১৩
শ্রেষ্ঠ-বণিকদের সমর্থন / ২২
রামরাজ্যবাদ / ৩৪
দাস, শূদ্র, স্ত্রী / ৪৭
বিবর্তনবাদ-ধর্ম-ঈশ্বর-আত্মা / ৫৪
মায়াবাদ দর্শন / ৬৫
বৌদ্ধদর্শন, মার্কসীয় দর্শন / ৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

পঞ্চাশের দশকে উত্তর ভারতে এক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছিল, নাম ছিল রামরাজ্য পরিষদ, দলটির উদ্দেশ্য ছিল সামন্তবাদ পুঁজিবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, বর্ণাশ্রমের কুপ্রথাকে আরো জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং মেয়েদের অবরোধের আড়ালে নিয়ে যাওয়া। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের পক্ষপাতী বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও এই দলটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা এবং ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের সমর্থনপুষ্ট বলে দাবি করেছিল। তাদের তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন করপাত্রী নামে এক দন্ডী সন্ন্যাসী। যিনি বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন শংকরাচার্যের অনুগামী, মায়াবাদী। তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তাধারাকে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, এবং সেটি ছিল ওই রাজনৈতিক দলের বাইবেল। উত্তর ভারতের যে অঞ্চলে এ দলটি সক্রিয় ছিল সেখানে মার্কসবাদী দলগুলি আজও হামাগুড়ি দিচ্ছে, অতএব পঞ্চাশের দশকে সেখানে মার্কসবাদী দলগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ করপাত্রী মহারাজ তাঁর বিশাল গ্রন্থে তত্ত্ব হিসেবে সঠিকভাবে প্রধান প্রতিপক্ষ বেছে নিয়েছিলেন মার্কসবাদকে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, আগামী দিনে এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পথে প্রধান অন্তরায় হবে মার্কসবাদীরা। তার পরেই আক্রমণ করেছেন বৌদ্ধদের। কারণ ভারতের বিপুল সংখ্যক দলিত অবহেলিত মানুষ বর্ণাশ্রমের শেকল ভেঙে ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে বৌদ্ধদর্শনের অনুগামী হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ করেছিল।

পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'রামরাজ্য ও মার্কসবাদ' গ্রন্থে করপাত্রী মহারাজের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকেই খন্ডন করেছেন। অপৌরুষেয় বেদ, সর্বজ্ঞ ঋষিদের বাণী, কিছু দিয়েই আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। রাহুলজীও ভারতীয় দর্শনে যে অগ্রগামী চিন্তাধারা ছিল, তার সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করেছেন মায়াবাদীদের। কারণ মায়াবাদীদের প্রধান বক্তব্য ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ এবং জাগতিক সমস্ত কিছুই মায়া। শোষণ মায়া, শোষণের কারণে মানুষের যন্ত্রণা মায়া, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও মায়া। রাহুলজী মায়াবাদীদের ব্যঙ্গ করেছেন এই বলে যে, যে মুহূর্তে তারা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রুটির দিকে হাত বাড়ায়, সেই মুহূর্তেই তারা নিজেদের মতবাদের বিরোধিতা করে।

এই বইটি প্রকাশের পর অনেক দিন কেটে গেছে। দ্বান্দ্বিক নিয়মে বিশ্বে কিছু অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে গেছে। মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের ত্রুটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপে সমাজবাদ সাময়িক পশ্চাদাপসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। উন্নত প্রযুক্তির সুবাদে পুঁজিবাদ আপন আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেও মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতার শেষ হয়নি। প্যারি কমিউনের পতনে বুর্জোয়াদের উল্লাস স্তব্ধ হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের বজ্র নির্ঘোষে। আমরা বিশ্বাস রাখি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক সত্য একদিন ফিনিক্স পাখীর মতো ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে আজ ভারতে আবার রামরাজ্যের ধ্বনি তুলে ধর্মীয় ফ্যাসীবাদ কায়েমী হয়ে বসতে চাইছে। ধর্ম সম্মেলনে তথাকথিত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা আবার বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলন করার পক্ষে জেহাদ ঘোষণা করছে। সাম্প্রদায়িক দলের মহিলা নেত্রীরা প্রকাশ্যে মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যেতে বলছেন, বলছেন পতিগৃহের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে। পশ্চাৎপদ অবহেলিত মানুষের জন্য সামান্যতম সংরক্ষিত সুযোগও সোচ্চার বিরোধিতার সম্মুখীন, এ রকম পরিস্থিতিতে রাহুলজীর বইটি এক প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেজন্যই রাহুলজীকে একটুও পরিবর্তিত না করে হুবহু তুলে ধরা হলো। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবর্ষে এটাই হোক আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(৯. ৪. ১৮৯৩—১৪. ৪. ১৯৬৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি কথা

শ্রীযুক্ত করপাত্রী সম্বৎ ২০১৪ (ইং ১৯৫৭)-তে 'মার্কসবাদ ও রামরাজ্য' নামে আটশো ষোলো পৃষ্ঠার একখানি বিশাল পুস্তক প্রকাশ করেছেন। মূল বইটি অবশ্য সংস্কৃতে লেখা। বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বাসুদেব ব্যাস বইটির হিন্দী অনুবাদ করেছেন। করপাত্রী মহাশয় বিংশ শতাব্দীর লোক নন, তিনি হাজার বছর কিংবা তাঁর লেখানুসারে, কোটি কোটি বছরের পুরানো পৃথিবীর মানুষ। তিনি যে সময়ের মানুষ, তখন পৃথিবী সূর্যপিণ্ড থেকে পৃথক হয়েছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্ত কিছুকেই ভ্রম বলে মনে করেন। তাঁর পক্ষে এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক।

করপাত্রী মহারাজ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ আটকানোর জন্য যে মহাযজ্ঞ করেছিলেন, তাতে দেশের আইনভঙ্গের দায়ে তাঁর কারাবাস হয়। আর তারপরই লেখনী তাঁর হাতে এসে চমৎকারিত্ব দেখাতে শুরু করে। বেচারা কারাগারেও ভক্তদের আতিশয্যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেননি। 'কারা অধিকর্তারা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখেননি। দিন রাত দর্শনার্থীদের সমাগম লেগেই থাকত।' সেজন্য কারাগারেও তাঁর একান্ত সময় খুব কমই জুটত। কারা-অধিকর্তারা তো সামান্য লোক, এ রকম একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দেবতারাও লালায়িত থাকেন। কারাগারে অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টা তো শুধু মাত্র কমিউনিস্টদের জন্য, যাদের দিল্লীর মহাদেব থেকে আরম্ভ করে পাড়ার ছোটখাটো দেবতারাও সুযোগ পেলে দু'কথা শোনায় এবং এদের সব সময়ের জন্যই যাতে কারাগারের ভেতরেই রাখা যায়, তেমন সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে।

বইটি থেকে অন্য যে সমস্ত গ্রন্থাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা গেছে যে সমস্ত বিষয়টি এই সত্যযুগীয় মহাত্মার আয়ত্তের বাইরে। মনে হয়, বেশ কিছু শিষ্যদের সহায়তাও অন্তরাল থেকে বইটির প্রকাশে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। সমস্ত পৃষ্ঠাই গুরুর নামে প্রকাশিত হবার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। এমনিতেই অদ্বৈতবাদে গুরু-শিষ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। হৃষীকেশের এক অগ্রণী মহাত্মা এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তাঁর এক শিষ্য হিন্দী এবং ইংরেজীতে যাই লেখেন, তার সবই গুরুর নামে প্রকাশিত হয়।

কোনো পরিকল্পনা অনুসারে বিষয়ের পরম্পরা বজায় রেখে বইটি লেখা হয়নি। যার ফলে সমস্ত বিষয়টিকে ক্রমপর্যায়ে ভাগ করা এক দুরূহ ব্যাপার। একই কথা এবং বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বইটির আর একটি বাধা। বইটি তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫৬ সালের 'চাতুর্মাস্য' কাশীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যাপন করা হয়। যদিও কাশী মহারাজকে বিশ্বনাথ মন্দির থেকে বঞ্চিত করেছিল, কিন্তু 'চক্ষুষ্মান্ না হয়েও গাঁঠরী বাঁধতে ওস্তাদ' বানিয়াদের জন্য এই বইটি তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। 'কল্যাণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রী জানকীনাথ শর্মা এবং 'শ্রীধর্ম' সংঘ শিক্ষা মণ্ডলের শ্রী হরিহর নাথ ত্রিপাঠি' যথেষ্ট পরিশ্রম করে সমস্ত বিষয়কে ক্রমবদ্ধ করার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন।

প্রকাশনা বিষয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন ছিল না, কারণ শেঠ-বানিয়াদের কাছে বইটি বাইবেল তুল্য। 'গীতাপ্রেস, গোরখপুর বইটি ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।' উৎকৃষ্ট কাগজে, সুন্দর টাইপে ছাপা ৪১৬ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের, কাপড়ে বাঁধাই বইটির দাম যে কোনো প্রকাশকই দশ বারো টাকার কম ধার্য করত না। কিন্তু বইটির দাম মাত্র চার টাকা করা হয়েছে। অতএব এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে বইটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রকাশিত। বস্তুত বইটির দাম হওয়া উচিত ছিল এক টাকা। শেঠদের 'ধর্মভাণ্ডারে' অর্থের তো আর অভাব নেই। তিন হাজারের পরিবর্তে তিরিশ হাজারের সংস্করণ হওয়া সংগত ছিল। বইটির প্রস্তাবনার রচয়িতা শ্রী গঙ্গাশংকর মিশ্রের মতে 'এখনও পর্যন্ত এমন কোনো পুস্তক রচিত হয়নি যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্তগুলির এত সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত বিচার করা হয়েছে। বইটির ইংরেজী অনুবাদ হওয়া খুবই প্রয়োজন, যার ফলে বিদেশী পণ্ডিতগণ এবং ভারতীয় বিদ্বজ্জন, যাঁরা হিন্দী জানেন না, তাঁরা উপকৃত হবেন।' আশা করা যায় শেঠ-বণিকেরা মিশ্রজীর এই ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখবে না। মিশ্রজী আরো লিখেছেন, 'যাঁরা সত্যের সন্ধান করছেন, তাঁরা এই বইটির জন্য স্বামীজীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটাই ঘটনা যে সত্যসন্ধানীরা বইটি পড়ে নিরাশই হবেন, কারণ এখানে ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় সত্য-অসত্যের কোনো ভেদাভেদই মানা হয়নি। বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য মার্কসবাদের বিরোধিতা করা। বইটির মুখবন্ধেও 'সাম্যবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে, যে 'এই বিষয়টিই বর্তমানে সর্বাধিক আলোচনার বস্তু।' সারা বইয়ে রামরাজ্যের কথা অনেক শোরগোল করেও অল্পই আছে। অবশ্য কোটি বছরের পুরানো সমাজ সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা বর্তমানে কোনো গভীর আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে, এমন আশা না করাই ভালো। এতদ্‌সত্ত্বেও বইটি কম চিত্তাকর্ষক নয় —যদি পড়ার মতো সময় ও ধৈর্য পাঠকের থাকে। বইটি হিন্দীতে হলেও বেশ গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ ছড়াছড়ি। এর ফলে সংস্কৃত না-জানা হিন্দী পাঠক ধৈর্য ধরে পৃষ্ঠাচারেকও পড়তে পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর চেয়ে সম্পূর্ণ বইটি সংস্কৃতে লেখা হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তার ফলে একদিকে সংস্কৃতজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিতদের সুবিধা হতো, অন্যদিকে কয়েক হাজার পাঠক পণ্ডশ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেত।

বইটিতে বিধবা স্ত্রীদের পুড়িয়ে মারা—সতীপ্রথার গুণগান করা হয়েছে। হাজার বছর নয়, মাত্র কিছুকাল আগে আমরা যে অন্ধকার যুগ ফেলে এসেছি, সেই যুগের মতো মেয়েদের বাল্যেই বিবাহ দেবার পক্ষে জোরদার ওকালতি করা হয়েছে। মেয়েদের ঘরের অভ্যন্তরে পর্দার আড়ালেই থাকা উচিত, এটা প্রতিষ্ঠা করার জোরদার প্রয়াস করা হয়েছে। শূদ্র এবং দাসেরাও মহারাজের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। উনি দাস প্রথার অনুমোদন করে বলেছেন, 'তারা' পরিবারের অংশ বিশেষ ছিল এবং তাদের আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের দায় তাদের প্রভুরাই বহন করত।' অবশ্য গৃহপালিত গবাদি পশুর দেখাশোনার দায়িত্ব মালিকদের হাতেই থাকে। আবার তাদের বাছুরদের ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক বেচে দেবার অধিকারও তারাই ভোগ করে। ১৯২৪ সালে নেপালে দাস-দাসী, স্থানীয়ভাবে যাদের নাম ছিল 'কমারা-কমারি', তাদের মুক্ত করা হয়েছে। রক্ষা এই যে, করপাত্রী স্বামী তখন সেখানে ছিলেন না, না হলে হয়তো সনাতন ধর্মের রক্ষায় তেমনভাবে ধর্নায় বসতেন, যেমনটি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন প্রবেশের বিরুদ্ধে বসে ছিলেন। নেপালের ৫৯,৮৭৩ জন দাস-দাসী মহারাজের 'সনাতন ধর্মের' ওপর পদাঘাত করে মুক্ত হয়ে গেলো, আর এমন কোনো ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেলো না, যে সাহস করে এগিয়ে এসে রাণা চন্দ্রসমশেরের এই ধর্ম বিরোধী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে।

ভগবান যাদের উচ্চবর্ণে জন্ম দিয়ে সমাজে পাঠিয়েছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের প্রাধান্যই মহারাজের পছন্দ। এ বিষয়ে যথা স্থানে আরো বিশদ ব্যাখ্যা করা যাবে। 'মাথা গোনা' অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কের মতাধিকার তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু। উনি সত্য যুগ ফিরিয়ে আনতে কৃতসংকল্প, কিন্তু বাধা কলিযুগ। দলিতদের একজন অগ্রণী নেতা এবং সংসদ-সদস্য এম. শিবরাজ ২৭শে এপ্রিল, ১৯১৮ সালে কানপুরে এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে এক আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, আর পরিবর্তন তখনি আসতে পারে যখন শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষের কাছে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতাকে সমর্পণ করে স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায়। ভারতে বনবাসকারী দশকোটি মানুষ যারা দীর্ঘকাল ধরে নানা উৎপীড়ন সহ্য করে আসছে—আজও অনুসূচিত (হরিজন) জাতির লোকেরা ক্রমশ পিছু হটছে—প্রায় ছ'কোটি লোক যারা অনুসূচিত জন-জাতি (শিডিউল্ড ট্রাইব) নামে আখ্যায়িত, তারা কষ্টকর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রায় বারো কোটি পশ্চাৎপদ শ্রেণী জনতার অবস্থাও অনুরূপ। এই বিশাল সংখ্যার জনতা, যাদের মতাধিকার আছে, তারা কেন তাদের সংখ্যানু-পাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে জায়গা পায় না, অথবা তাদের জায়গা দেওয়া হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের সঠিক প্রতিনিধিত্বই বা হয় না কেন ? বহুসংখ্যক লোক অল্পসংখ্যক হয়ে গেলো, আর অল্পসংখ্যকরা সাধারণ মুদীখানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ করে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। অধিকাংশ মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না, আর সামান্য কিছু লোক বিনা শ্রমে বিলাসে জীবন কাটাচ্ছে। বহুজন সমাজকে এই সামান্য সংখ্যক লোক নিরক্ষর-পঙ্গু বানিয়ে, তাদের ক্রীতদাস কিংবা তার চেয়েও নিম্নতম অবস্থায় নিয়ে চলেছে।' ('মধ্যম মার্গ' ১১ই মে, ১৯৫৮)

করপাত্রী মহারাজ এখনও বহুজনের রোষ কি বস্তু, তা জানেন না। জানতে ইচ্ছুক হলে উনি মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) প্রদেশ ঘুরে আসতে পারেন। ওখানেও সনাতন ধর্মের নামে হাজার বছর ধরে শতকরা তিন ভাগ ব্রাহ্মণেরা সমস্ত সম্পদ অধিকার করে রেখেছিল। শতকরা সাতানব্বই ভাগ মানুষকে শূদ্র এবং অতি শূদ্র সংজ্ঞা দিয়ে তাদের নারকীয় জীবন কাটাতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বহুজন সমাজের এই মিথ্যা, ধোঁকার টাটিকে চিনতে সময় লাগেনি আর তার ফলে এখন 'ব্রাহ্মণ' নাম শুনলেই তারা ঘৃণায় মুখ ফেরায়। করপাত্রী মহারাজ এবং তার চেলাচামুণ্ডাদের হঠকারী কার্যকলাপ আমাদের এখানেও সেরকম তিক্ততার বীজ রোপণ করতে পারে। মহারাজের এটা বোঝা উচিত যে, যাদের অধিকারের ওপরে আঘাত হানার জন্য তিনি খড়্গহস্তে আবির্ভূত, তাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। মহারাজের বাণী বধিরের কানেই বর্ষিত হোক, তাতেই তাঁর মঙ্গল।

বইটির জবাবে ও রকম সাইজের আর একটি বই লেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এ বইয়ের সমস্ত সিদ্ধান্তের জবাব আমার 'বিশ্বের রূপরেখা', 'মানব সমাজ', 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'ভাগো নহি দুনিয়াকো বদলো', 'আজকের রাজনীতি' ইত্যাদি বইয়ে এসেই গেছে।

মুসৌরি
২৪.৫.৫৮

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋষি করপাত্রীর ঋষিত্ব

করপাত্রী মহারাজ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অর্থাৎ পরমেশ্বরীয় জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনে করেন, যার ওপরে ভিত্তি করেই পৌরাণিক মুনি ঋষিরা একই সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে দেখে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ লিখেছেন। ঐশ্বরিক জ্ঞান ভিন্ন অন্য যে কোনো জ্ঞানই নাকি ভ্রান্ত জ্ঞান। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তাঁর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এটাকে একজন ঋষির ঋষিত্ব বিবেচনা করা উচিত।

ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ

মহারাজ করপাত্রী শাস্ত্রের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলছেন : 'সে যুগের ঋষিদের জ্ঞান আজকের যুগের চেয়ে অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁদের সন্নিকৃষ্ট, বিপ্রকৃষ্ট, ইহলোক, পরলোক, অস্ত্রশস্ত্র, বিমান ইত্যাদি বিষয়ে যে জ্ঞান ছিল, আজকের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হননি।'

'শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে, এ যুগে বিকাশ অপেক্ষা ক্ষয়ের পালাই ভারী বলে দেখা যায়।'

'পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও একথা প্রমাণিত হয়নি যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে।'

'দিল্লীর লৌহস্তম্ভ ভারতেই নির্মিত হয়েছিল কিন্তু ও ধরনের স্তম্ভ আজও কি ইউরোপ বানাতে পারে?'

করপাত্রী মহাশয় তাঁর পূর্বজ পরশুরামের মতোই উগ্ররূপ ধারণ করে আছেন। তাই তাঁর সামনে বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সমস্ত জারি জুরিই ব্যর্থ। ভূবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র সবই ঐশ্বরিক জ্ঞানের কাছে তুচ্ছ। তিনি বলছেন : 'পূর্বজদের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় বর্তমানের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক নিম্নমানের।'

অতএব আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'অস্ত্র-শস্ত্র বিমানাদি' তৈরির প্রকৌশলে আজকের চেয়ে যে অনেক এগিয়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি। তারা মাত্র দেড় টন ওজনের স্পুটনিক আকাশে উৎক্ষেপণ করে বড়াই করত না। বিশ্বামিত্র তো মহাকাশে আরেকটা পৃথিবী স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। মহারাজ মনে করেন শুধুমাত্র বুদ্ধিতেই নয়, আকৃতিতেও প্রাচীন আমলের মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী আজকের প্রাণীদের চেয়ে বৃহত্তর ছিল।

'পশু এবং মানুষের মধ্যে যে ধরনের বুদ্ধি, বল-পরাক্রম বা আকৃতি সহস্র বৎসর আগে ছিল, বর্তমানে তার পরিমাণ অনেক কম। প্রাচীন যুগের মানুষের অস্থি-পঞ্জর এবং তরবারি, ভল্ল আদি এর সাক্ষী।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য করপাত্রী মহারাজ বর্ণিত বিশালাকার অস্থি-পঞ্জরের সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা কোথাও পাননি, যাদের গুম্ফ বিস্তৃত ছিল কয়েক যোজন। মনে হয় কোনো গল্প-কথায় আস্থা রেখে তিনি বলছেন : 'নেভাদায় মেজর জন. টি. রীড এক ব্যক্তির পদচিহ্ন এবং একটি সুনির্মিত পাদুকার তলদেশের সন্ধান পেয়েছেন যা প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে পঞ্চাশ লক্ষ বছরের প্রাচীন।'

মহারাজ অবশ্য আমাদের কষ্ট করে জানাননি যে ওই পঞ্চাশ লক্ষ বছরের প্রাচীন পাদুকার তলটি ক'হাত লম্বা ছিল।

ঋষিরা সবই করতে সক্ষম ছিলেন, সমস্ত কেরামতিই ছিল তাঁদের করায়ত্ত, কারণ —'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি' অর্থাৎ আদি ঋষিরা যেমনটি বলেন, ঘটনা তাকে অনুবর্তন করে মাত্র।

অতএব তারা যদি ঘট-কে পট বলেন, তাহলে ঘট-কে পটে পরিবর্তিত হতেই হবে।

তাহলে আবিষ্কার ইত্যাদির কি প্রয়োজন ? কারণ তাঁরা অর্থাৎ ঋষিরা যদি বাতাসকে আদেশ করতেন, এই মুহূর্তে বিমানে পরিণত হও, তাহলে বাতাস সেই মুহূর্তে বিমানে রূপান্তরিত হতে বাধ্য ছিল। তারপর সেই বিমান যাত্রায় কোনো খরচ খরচাও ছিল না। করপাত্রী মহারাজের ভক্তদেরও ও রকম বিমান এখন থাকলে খরচ করে গুরুদেবের জন্য টিকিট কাটতে হতো না। কারণ কোনো এক সময়ে পাত্র উপলব্ধ না থাকায় যিনি করতলে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, যার জন্য মহারাজের নাম করপাত্রী, সেই তিনি এখন সময় বাঁচাবার জন্য বিমান ভ্রমণেই বেশি আগ্রহী।

যেভাবে বর্তমানে বিশ্বজনমত পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, এর পরীক্ষা বন্ধের দাবি উঠছে, এগুলোর সঞ্চিত ভাণ্ডারকে নষ্ট করে ফেলার কথা উঠছে, সে রকমই জনকল্যাণের স্বার্থে ঋষিরাও প্রাচীন আমলের যন্ত্র সম্বন্ধে বলেছেন : 'কলকারখানার বিকাশ ব্যতিরেকেই প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিক, ধার্মিক এবং সামাজিক বিকাশ এক উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যদিও নানা ধরনের মহাযন্ত্রের বিকাশ সে যুগেও হয়েছিল, কিন্তু তার অশুভ পরিণামের কথা ভেবে সেগুলিকে অনর্থ বিধান দিয়ে, সেগুলোর ওপর নানা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। তথাপি বিশেষ ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান, রথ এবং শিল্পকলার বিকাশ, ইত্যাদি বিশ্বকর্মাদের দ্বারা ঘটতেই থাকত।'

মহাযন্ত্রের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হয়েছিল। এমন তথ্য যদি শাস্ত্রের আদ্যপান্ত খুঁজেও না পাওয়া যায়, তাহলে মহারাজের সন্তুষ্টির জন্য ধরে নিতে হবে যে, সে রকম শাস্ত্র কোনো কারণে বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে, এবং একমাত্র করপাত্রী মহারাজের ঐশ্বরিক জ্ঞানই এর সন্ধান রাখে। এ না হলে আর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বিশেষত্ব কি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত ইতিহাস

করপাত্রী মহারাজের মতে 'প্রস্তর ইত্যাদি যুগের ধারণাই ভিত্তিহীন।'

কিন্তু ধরিত্রী মা তো আর মিথ্যে বলেন না। তিনি তাঁর ক্রোড়ে লুকানো প্রমাণ সারা বিশ্বের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন এবং সেই প্রমাণের সত্যতা বিশ্বের বিদ্বজ্জনেরা মেনেও নিয়েছেন। সে সমস্তই ভিত্তিহীন আর 'মুখমন্তীতি বক্তব্য' অর্থাৎ 'মুখের কথাই সত্য' অনুসরণকারীদের কল্পনাই সত্য।

আর শোনা যাক : 'অনেক শিলালিপি তো একেবারেই কাল্পনিক।'

'প্রায়শই ইতিহাস লেখা হচ্ছে দুরভিসন্ধিমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ মনোভাব থেকে। কতকগুলো মুদ্রা আর ভগ্নস্তূপের ওপর ভিত্তি করে কল্পনার প্রাসাদ রচনা হচ্ছে সেখানে। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অধিকারী ঋষিদের রচিত ইতিহাসই একমাত্র প্রামাণ্য ইতিহাস। এই ঋষিরা সমাধির মাধ্যমে সমস্ত ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন।'

ভগ্নস্তূপ, মুদ্রা আর শিলালিপি থেকে কত সহজেই না রেহাই পাওয়া গেলো, তার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান লাভের পথটিকে কত সরল করে দেওয়া হলো। আমাদের দেশের ইতিহাসবিদ্গণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সকলেরই সব ছেড়ে-ছুড়ে মহারাজের শরণ নেওয়া উচিত। মহারাজের ঐশ্বরিক জ্ঞানের একবিন্দুও যদি তাঁরা পেয়ে যান, তাহলে তাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। অবশ্য চিন্তিত হবার প্রয়োজন কি যখন হাতের কাছে পথপ্রদর্শক হিসেবে করপাত্রী মহারাজের এই অলৌকিক গ্রন্থখানাই মজুদ আছে।

'অপৌরুষেয় বচন (বেদ) নিজেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। ধর্ম, ব্রহ্ম ইত্যাদি বেদ অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ স্বয়ংই প্রমাণ।'

'রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন ইতিহাসের রচয়িতা বাল্মীকি, ব্যাস ইত্যাদি অনুমান, সংবাদদাতার তার-বার্তা, চিঠিপত্র ইত্যাদির সাহায্যে ইতিহাস রচনা করেননি, তাঁরা ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, যার প্রভাবে সমস্ত ঘটনাই তাঁরা প্রত্যক্ষ রূপে দেখেছিলেন এবং সেই মতো ইতিহাস লিখেছেন।'

'...অধ্যাত্মবাদীদের বিশ্ব এবং তার ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সীমিত নয়, বস্তুত এই ইতিহাস কোটি কোটি বছরের।' (ভোজরচিত) 'সমরাঙ্গন সূত্রধার' (অনুসারে) রাজ্যধর তক্ষা নামে জনৈক ছুতার এমন একটি বায়ুযান তৈরি করেছিলেন যে, সেটি একটি মাত্র কীলকের আঘাতেই আটশো যোজন যেতে সক্ষম ছিল। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত পুষ্পক রথ আধুনিক সমস্ত বিমানের চেয়ে বড়, কলাকৌশল সমন্বিত, দ্রুতগামী এবং নিরাপদ ছিল। ব্রহ্মাস্ত্র পাশুপত অস্ত্র ইত্যাদির সম্মুখীন হবার সাধ্য বর্তমানের হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি বিধ্বংসী মারণাস্ত্রেরও ছিল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আবারো বলছেন : 'রামায়ণ, মহাভারত রচিত হয়েছে সমাধি ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রয়োগে। টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে এর রচনা হয়নি, তেমনই এর রচনার ভিত্তি কোনো ভগ্ন মূর্তি, শিলালিপি, স্তম্ভ বা কোনো মুদ্রা নয়।'

মূর্তি, শিলালিপি কিংবা মুদ্রার ওপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাস যে প্রকৃত পক্ষে কত পলকা, ভঙ্গুর তাও আমরা জানতে পারছি করপাত্রী মহারাজের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে : 'রামায়ণ-মহাভারতই পৃথিবীর প্রাচীনতম ইতিহাস, যার অনেক প্রমাণ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ভূগর্ভের বস্তুগুলির মাধ্যমে পাওয়া গেছে। ওই সব প্রাচীন ইতিহাস এবং অপৌরুষেয় বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে এটাও প্রমাণিত যে শুধু মাত্র মনুষ্য সমাজেই নয়, দেবতা, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতির মধ্যেও ব্রাহ্মণ ইত্যাদির বর্ণভেদ সৃষ্টির চেষ্টা আদিকাল থেকেই চলে আসছে।

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ভূগর্ভ থেকে রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাস হবার প্রমাণ স্বরূপ কি কি বস্তু পাওয়া গিয়েছে সে সম্বন্ধে অবশ্য মহারাজ নীরব। আমাদের ইতিহাসবিদদের অজ্ঞতা তাঁর কথায় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন : 'বর্তমান সৃষ্টির ইতিহাস কোটি কোটি বছরের...'

'বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে কোটি কোটি বছরের, অগণিত যুগের, কল্পের এবং বিভিন্ন সৃষ্টির ইতিহাস বর্তমান।'

দেখা যাচ্ছে, এ শুধু বস্তু আর মানুষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেই থেমে নেই। আর্য ইতিহাসের প্রয়োজন তো এর চেয়েও বেশি : 'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছরের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারের ইতিহাস। একমাত্র ঈশ্বরবাদীরাই বড় বড় পুরুষার্থ কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে। সমুদ্রে যোজনব্যাপী সেতু ঈশ্বরবাদীরাই নির্মাণ করেছে, করেছে অখণ্ড ভূমণ্ডলে সাম্রাজ্য বিস্তার। পুষ্পক রথের মতো বায়ুযান নির্মাণ, হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে কোটি গুণ শক্তিশালী মারণাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র ঈশ্বরবাদীরাই নির্মাণ করেছে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য দিব্য শক্তির (দেবতা, ভূত, প্রেত) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তারাই সমর্থ হয়েছে।

'পরলোক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি-দৃষ্টিতে প্রেততত্ত্ব এক সিদ্ধ বিষয়।'

কোটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিহিত ছিল একটি ব্রহ্মাস্ত্রের মধ্যে। ওর একটা ছাড়লেই তো আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো। ওই ভয়ংকর মারণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বোধহয় ঋষিরা তপঃপ্রভাবে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত ভাষার জননী সংস্কৃত

'সংস্কৃতই বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা এটা প্রমাণিত।'

'যখন সংস্কৃতের চেয়ে প্রাচীন ভাষা এবং বেদের চেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বিরল এবং এর প্রাচীনতা তর্কাতীত, অতএব মনু ইত্যাদির সঙ্গে সহমত হয়ে সংস্কৃতকেই অনাদি ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।'

'সংস্কৃতই আদিম ভাষা, অন্যান্য সমস্ত ভাষাই এর অপভ্রংশ। আর্য, সেমিটিক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাও এই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যখন সৃষ্টির মূল একজন, তখন আদিজ্ঞান এবং আদি ভাষারও একটাই রূপ হওয়া উচিত।'

মহারাজ বেদের মহিমা আর তার ভাষার গৌরবগাথা কত সহজেই না আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, সে তুলনায় আজকের ভাষাতাত্ত্বিকেরা নিছক অন্ধকারে হাত পা ছুঁড়ছেন। আসলে এদের মধ্যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের একান্ত অভাব রয়েছে।

প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয় ভারতবর্ষে

বেদভূমি-ভারত, বিশ্বে যে অতুলনীয়, মহারাজ আরো চমৎকার করে বলেছেন: 'সপ্তদ্বীপের সমাহারে গড়া মেদিনী, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ। আবার জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠতম।...এখানেই সমস্ত রঙের মানুষই দেখতে পাওয়া যায়, অতএব এখানেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে।'

'...হিমালয়ের মানস নামক জায়গায় মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেজন্যই মানস নাম জায়গাটির। এশিয়ার অন্তর্গত ভারতেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয় এটা সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়েছে। বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব (২০১৩ সম্বৎ) বারো কোটি পঁচলক্ষ তেত্রিশ হাজার তিরিশ বছর আগে হয়েছিল। যদিও সৃষ্টির প্রারম্ভ তারও বহু আগে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সৃষ্টির শুরু একশো পঁচানব্বই কোটি আটান্ন লক্ষ পঁচাশী হাজার সাতান্ন বছর আগে।'

মহারাজের অবশ্য জানা নেই যে, জম্বুদ্বীপের ধারণা সম্বলিত ভূগোল বর্তমানে ভুল প্রমাণিত হওয়ায় বাতিল হয়েছে। সে কালের ঋষিরা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সাহায্যে যে ভৌগোলিক জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন এবং উত্তরকালের জন্য রেখে গেছেন, সেই অনুসারে পৃথিবীর মধ্যভাগে সুমেরু পর্বতের অবস্থান, যার উচ্চতা কয়েক যোজন এবং এই পর্বত পরিখার মতো চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত। সমুদ্র ও পর্বত মেখলার আরম্ভ ওই পরিখার কিনারা থেকে। এর মধ্যে সপ্তম সমুদ্র হলো লবণ সমুদ্র। উত্তরে অর্থাৎ সুমেরু পর্বতের উত্তরে, উত্তর কুরু-দ্বীপ, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে বিদেহ এবং পশ্চিমে অবর গোদানীয়, এই চারটি দ্বীপ বর্তমান। পরবর্তী কালের জ্যোতিষীরাও এই ভৌগোলিক জ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রান্তি বুঝতে পেরে পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপার পরিবর্তে চতুর্দ্বীপা ভাবতে শুরু করে।

জানি না মহারাজ ঋষিদের ভূগোল অনুসারে 'মানস' স্থানটিকে নির্ধারণ করেছেন, নাকি বর্তমানের 'মানস সরোবর'-এর অবস্থান জেনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানস সরোবর আমাদের দেশে অবস্থিত নয়। চীনের অন্তর্গত তিব্বত অঞ্চলে। আফসোস, প্রথম মানুষ সৃষ্ট হবার স্থানের গৌরব আমাদের বরাতে জুটল না। মার্কসবাদী চীন বাজীমাৎ করে ফেলল। তাহলে 'ভারতেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়। একথা প্রমাণিত'—এই মহান্ উক্তিটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ভোজন ইত্যাদি থেকে গাত্রবর্ণের ভেদাভেদ

আহারের ওপর ব্রাহ্মণদের অগাধ আস্থা চিরকালই। করপাত্রী মহারাজের জন্মও এই ভোজনপটুদের বংশে। ইউরোপের অধিবাসীদের গায়ের রঙ সাদা। ওখানে কৃষ্ণবর্ণের মানুষের সংখ্যা খুবই সামান্য। জাপানে অধিকাংশ লোকের গায়ের রঙ হলুদ, সেখানে আবার কালো কিংবা শ্যামলবরণ কাউকে দেখা যায় না। ওখানে গিয়ে কেউ যদি বলে যে, গর্ভবতী মা শাক আহার করলে তার সন্তান কালো রঙের হবে, তাহলে ওখানকার লোক এটাকে পাগলের প্রলাপ মনে করবে। কিন্তু আমাদের দেশের ঋষিরা এই বিধানই তাঁদের শাস্ত্রে দিয়েছেন এবং খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন যে ভোজনের তারতম্য অনুসারেই সন্তানের গায়ের রঙ নির্ণীত হয়। সেই সব ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বর্তমান প্রতিনিধি বলছেন :

'বৃহদারণ্যকে সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়—কেউ যদি কামনা করে যে তার পুত্র গৌর বর্ণের, এবং এক বেদে পারদর্শী হোক, তাহলে তাকে বিধানানুসারে ঘি মিশ্রিত ক্ষীর আহার করতে হবে। যার বাসনা পুত্রের গায়ের রঙ হোক কপিল কিংবা পিঙ্গল এবং তার দুই বেদের জ্ঞান অর্জিত হোক, তাহলে সেই মায়ের জন্য ঘি মিশ্রিত দধি ভক্ষণের বিধান শাস্ত্রসম্মত। এভাবেই শ্যামবর্ণ, লোহিতাক্ষ এবং ত্রিবেদ-জ্ঞানী পুত্র কামনা করে যে জননী, তার জন্যও ওই ধরনের একটি আহারের বিধান দেওয়া আছে। তৎকালীন লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্মের দ্বারা রঙ-রূপের যে পরিবর্তন ঘটে, এর মধ্যে তথাকথিত বিবর্তনবাদের কোনো প্রসঙ্গই নেই। রাজা দশরথের পুত্রদের মধ্যে রাম এবং ভরত ছিলেন শ্যামবর্ণ এবং লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ছিলেন গৌরবর্ণ। বসুদেবের পুত্রদের মধ্যেও বলরাম গৌর আর কৃষ্ণ শ্যামল। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণপুত্ররা ছিলেন শ্যামল বরণ। ব্যাস শুক্ল ইত্যাদির গাত্রবর্ণও শ্যামল। অতএব একথা বলা যায় না যে, সমস্ত আর্যরাই গৌর বর্ণের ছিলেন।'

ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই কৃষ্ণবর্ণের নিষাদ (অস্ট্রিক), পীতাভ বর্ণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গোলিয়ান, কিরাত (মোন-সুমের), তাম্রবর্ণের প্রাচীন সিন্ধুবাসীগণ (দ্রাবিড়) আর গৌরবর্ণের আর্য-খস্ এই চার জাতির মিশ্রণ ঘটেছে এবং তারই ফলে আমাদের মধ্যে বর্ণের বিভিন্নতা দেখা যায়। অবশ্য এসমস্ত তথ্য ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অধিকারী শ্রীকরপাত্রী মহারাজের মতে অপ্রমাণিত। 'কালো রঙের ব্রাহ্মণ এবং ফরসা রঙের চামার' অসম্ভব এবং অনুচিত বলে বিবেচিত হতো, সেজন্যই করপাত্রী মহারাজ এই সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে। 'সমস্ত আর্যই গৌরবর্ণের অধিকারী ছিলেন, একথা বলা যায়।' নিষাদ রক্তের সংমিশ্রণে যে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণবর্ণের ব্রাহ্মণের দেখা মেলে, পাঞ্জাব থেকে যেমন যত পূর্বে এবং দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সংখ্যাটাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে মহারাজের ভোজন-প্রক্রিয়ার ওপরেই সর্বাধিক আস্থা এবং সেটা সেকালের ঋষিদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। উনি আরো নানা ধরনের ভোজন-প্রক্রিয়ার কথা আমাদের জানিয়েছেন, যার ফলাফল নাকি অব্যর্থ। 'বৃহদারণ্যক' উদ্ধৃত করে বলছেন: 'য ইচ্ছেত পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত; সর্বান্ বেদান অনুব্রবীত, সর্বমায়ুরিয়াদিতি, মাংসোদনং পাচয়িত্যা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্ননীয়তাম ঈশ্বরো জনয়িত বা ঔক্ষেণ বায়র্ষভেণ বা।'

(অর্থ: যদি কেউ ইচ্ছা করে যে আমার পুত্র পণ্ডিত সামাজিক প্রতিষ্ঠাশালী হউক, যাহার বাণী শ্রুতিমধুর, সকলে শুনিতে আগ্রহী, সে সম্পূর্ণ বেদ জ্ঞানের অধিকারী, দীর্ঘায়ু; সেক্ষেত্রে মাতার উচিত ঘৃতপক্ক বৃষ কিংবা গাভী মাংস সেবন করা)

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আর সেজন্যই শংকরাচার্য তাঁর টীকাভাষ্যে বলেছেন: 'মাংসোদনং—মাংস-মিশ্রমোদনম্ তস্মাংসনিয়মার্থ মাহ-অক্ষেণ বা মাংসেন। উক্ষা সেচনামর্থঃ পুঙ্গবস্তীদয়ং মাংসম্। ঋষভস্তুতোঽপ্যধিকবয়াঃ তদীমার্ষভং মাংসম্।'

অর্থাৎ মাংস সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বয়সের বৃষের হওয়াই শ্রেয়। 'গোমাংসের প্রতি আজ যতই অনীহা থাক না কেন। প্রাচীন কালে এর প্রতি মানুষের অনুকূল মনোভাবই ছিল।' (লেখকের গ্রন্থ 'ঋগ্বেদিক আর্য'; পৃঃ ৪২) আশা করা যায়, করপাত্রী মহারাজ তাঁর গুরু শংকরাচার্যের বিরোধিতা করবেন না।

রঙের পার্থক্য সম্পর্কে করপাত্রী মহারাজের আরো বক্তব্য এই যে: 'ইহা ভোজন ব্যতিরেকে, জলবায়ু এবং কর্মফলের ওপরও নির্ভরশীল।'

ইউরোপে নিশ্চয়ই এই পার্থক্য প্রতি ঘরে ঘরে দেখা যাবে, কারণ সকলের কর্মফল একরকম নয়।

'রূপ, রঙ এবং মনের ওপর বাহ্য পরিস্থিতির প্রভাব অবশ্যই পড়ে। মৈথিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্জাবী এবং দ্রাবিড়দের ওপরে দেশ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিশ্চই আছে।··· কর্মানুসারেই, রূপ, রঙ, সৌন্দর্য, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রাপ্তি হয়।'

ঋষিদের দিব্যদৃষ্টি

ঋষিদের দিব্যশক্তির ওপরে করপাত্রী মহারাজের অখণ্ড বিশ্বাস। কলিযুগের প্রভাবে যদি সেই দিব্যশক্তিতে কিঞ্চিৎ ঘাটতি দেখা যায়, তাহলে সেটা ঘটছে শাস্ত্রানুসারেই। মহারাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিব্যশক্তির সামনে নানা ধরনের বাধা আসছে, যার একটি উদাহরণ—কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে শূদ্রেরা দলে দলে ঢুকে পড়ল, বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালার সময় হাত দিয়ে পিণ্ড ছুঁয়ে সে হাত তার মাথায় ঠেকাল, তবু কিন্তু ধরণী দ্বিধা হলো না এটাই আশ্চর্যের। করপাত্রী মহারাজ অবশ্য এর পর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে শূদ্র, স্পর্শদোষ ঘটায় বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর মহারাজ বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছাকাছি একটি নতুন বিশ্বনাথ মন্দিরের স্থাপনা করেছেন। স্বর্ণছত্র মাথায় উজ্জ্বল বিশ্বনাথের শিবালয় নির্মাণ এখনও অসম্পূর্ণ আছে, সে জন্যই নতুন বিশ্বনাথ এখনও একটি ছোট চালাঘরেই অধিষ্ঠান করছেন, তবে শেঠ-বণিকদের কৃপায় ওই আটচালারই বিশাল মন্দিরে রূপান্তরিত হওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঋষিবচন যখন এতই অভ্রান্ত এবং স্বয়ং প্রকৃতিও তাকে অনুসরণ করে, তাহলে শেঠ-বণিকদের প্রয়োজন কি? যদি ঋষি করপাত্রীর সেই দৈবশক্তি না থাকে, তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, সেই সব তথাকথিত দিব্যশক্তি কলিযুগের প্রভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে।

করপাত্রী মহারাজ একমাত্র পৌরাণিক ইতিহাসকেই সর্বৈব সত্য বলে বিশ্বাস করেন। ভূত-প্রেত ইত্যাদির অস্তিত্ব যদি নাই থাকে, তাহলে মন্ত্র-তন্ত্র জানা ব্রাহ্মণ বেচারাদের কি উপায় হবে? তাদের রুজি রোজগারের কি হবে? অতএব তিনি এ বিষয়েরও সমাধান বাতলে দিয়েছেন: 'প্রেতাত্মার কল্পনা শুধু মাত্র শাস্ত্রীয়ই নয়, উপরন্তু তার প্রত্যক্ষ চমৎকারিত্বের অনেক প্রমাণ আজও উপলব্ধ আছে। প্রেত-তত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে অন্য লোকের অজানা গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান পরলোকবাদীরা আমাদের দিয়ে থাকেন।'

'অনেক জায়গায় সকলের সামনে গৃহ প্রাঙ্গণে হঠাৎ দেখা যায়—ইঁট, পাথর অথবা অন্যান্য অপবিত্র বস্তুর বর্ষণ হচ্ছে, ঘরের জিনিসপত্র কাপড়, বাসন ইত্যাদি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আরো নানাবিধ রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, পুলিশী অনুসন্ধানেও যার কিনারা করা যাচ্ছে না। পূজা-পাঠ, তন্ত্র-মন্ত্র এসব কিছুর সত্যতা আছে। ঈশ্বর অবিশ্বাসী নাস্তিক এবং সাংখ্যদর্শনে বিশ্বাসীরাও তন্ত্র-মন্ত্রের গুণের কথা স্বীকার করেন। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যেও তন্ত্র-মন্ত্রের চলন আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার এবং আন্ধবিশ্বাস দূর করতে চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাতে অনেকাংশে সফলও হয়েছে, সে সমস্ত কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস, করপাত্রী মহারাজের অনুগ্রহে আবার মানুষের মনে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পাচ্ছে, মানুষ আবারো পথভ্রষ্ট হচ্ছে। যতক্ষণ না মানুষ অপৌরুষেয় বেদের কাছে বিনা তর্কে মাথা নত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের কোনো পথ খোলা নেই। মানুষের 'কল্যাণের' একমাত্র ঠিকাদারগণ এ বইটি প্রকাশ করে আমাদের বড়ই উপকার করেছেন বলতে হবে। কথায় কথায় বেদের দোহাই দিয়ে থাকেন, এমন লোকের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাঁদের সম্পূর্ণ বেদ পড়া আছে কিংবা বেদে বর্ণিত ব্রাহ্মণের দেখা পেয়েছেন। শুধুমাত্র পড়েছেন, এমন লোকের সংখ্যাও হাতে গোণা যায়। সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণের উৎসই নাকি বেদ। যদি বেদে বর্ণিত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায় তাহলে করপাত্রী মহারাজের মতো শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরও শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে যেতে পারে। বেদে বর্ণিত আর্যরা অশ্বমাংস খেতেন। অশ্ব বা গোমাংস তো তাঁদের ইন্দ্রের প্রিয় খাদ্য ছিল।

তারপর আরো বিড়ম্বনার বিষয়, যে বেদকে এত উচ্চাসন দেওয়া হচ্ছে এবং তার প্রবল সমর্থন পাওয়া যায় জৈমিনির মীমাংসায়, করপাত্রী মহারাজও এ তথ্যের অনুমোদন করেন। অথচ জৈমিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। কপিলের সাংখ্যদর্শন-নিরীশ্বরবাদী দর্শন, কণাদের বৈশেষিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে না। দুটি মূল শাস্ত্র গ্রন্থের তিনটিই নিরীশ্বরবাদ প্রচার করছে। তথাপি করপাত্রী মহারাজের ঘোষণা—প্রাচীন ইতিহাস ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সিদ্ধ করার ইতিহাস। বর্তমান বিশ্বেও যে ধর্ম অনুসরণকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তা হলো বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মেও ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। এশিয়া ইউরোপের একটা বিশাল ভূখণ্ড নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্টদের মার্কসবাদকে মেনে নিয়েছে। শাস্ত্রানুসারে কলিযুগ নাকি থাকবে চারলক্ষ বত্রিশ বছর পর্যন্ত। এর মধ্যে কেটেছে মাত্র পাঁচ হাজার বছর। এতেই নাকি চারদিক ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এখন এই দুঃসময়ে তিনি কি পরিবর্তন আনতে পারেন সেটাই দেখবার বিষয়। মার্কসবাদ ভারতের 'সত্য ইতিহাস' অনুযায়ী কলিযুগের বলে বলশালী। এটা মেনে করপাত্রী মহারাজ নীরব থাকলেই ভালো করতেন। এখন পাথরে মাথা ঠুকে কি হবে? 'তাই ঘটে যা রাম ইচ্ছে করেন।' তাহলে কলিযুগের এহেন উৎপাত তাও নিশ্চয়ই হচ্ছে রামের ইচ্ছেতেই।

জয় হোক কলিযুগের—যে শূদ্র এবং দাসদের উদ্ধারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

শেঠ-বণিকদের সমর্থন

বইটির মূল উদ্দেশ্য শেঠ-বণিকদের সমর্থন করা। এছাড়া কালের প্রভাবে যে সমস্ত কুপ্রথা সমাজ থেকে বিদূরিত হয়েছে, সেই কুপ্রথাগুলিকে সমর্থন করা, সেগুলিকে তাদের আগের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা। নিদেন পক্ষে ওই কুপ্রথাগুলি বিনাশ হওয়ায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করা।

সামন্ত-জমিদারদের সমর্থন

রাজতন্ত্র চিরকালের জন্য অস্তাচলে গিয়েছে। জমিদারি তালুকদারিও অস্তাচল-গামী। কিন্তু তাতে কি? শাশ্বত অনাদি অটল সনাতন ধর্ম যার পক্ষে সে ধ্বংস হয়ে গেলেই হলো? সে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই আবার জেগে উঠবে। এই প্রত্যয় নিয়েই তো করপাত্রী মহারাজ বলেন: 'জমিদারি, জায়গীরদারি সম্বন্ধে মার্কসবাদী এবং অন্যান্যদের ধারণা সর্বাংশে মিথ্যা। রাজতন্ত্রে, রাজার পর রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হতেন, অন্যান্য পুত্ররা জীবন ধারণের জন্য জায়গীর পেতেন। এভাবে বহু জমিদারির সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের পর মন্দিরের নামে, আচার্য এবং পণ্ডিতদের পুরস্কার হিসেবে অনেক জায়গীর বণ্টিত হতো। অনেকে তাঁদের স্বেদ ঝরিয়ে উপার্জন করা অর্থে জায়গীর ক্রয় করতেন। এ সমস্ত ভূমিই ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ। শুক্র-নীতি অনুসারে বৈধ প্রভুত্ব, দাতৃত্ব এবং ধনিকত্ব, তপস্যার ফল। প্রার্থিতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সবই পাপের ফল।'

'স্বামিত্বং চৈব দাতৃত্বং ধনিকত্বং তপঃফলম্।
এনসঃ ফলমার্থিত্বং দাসত্বং চ দরিদ্রতা॥'

'শুক্র লিখেছেন যে প্রতি বছর যিনি বিনা প্রজাপীড়নে এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ মুদ্রা পর্যন্ত বৈধ উপায়ে উপার্জন করেন তাঁকে সামন্ত বলা যায়।'

করুণাময় করপাত্রী মহারাজের দৃষ্টিতে শীত-গ্রীষ্মে শরীর পাত করে যারা ফসল ফলায় সেই কৃষক, ক্ষেত মজুরের দল পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করছে আর তাদের শ্রমে উৎপাদিত সম্পদে যারা বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাচ্ছে তারা সকলে বিগত জন্মের পুণ্যাত্মা।

তারপর শ্রীমুখের বচন: 'জমিদার জায়গীরদারদের ভূমি অপহরণ ব্যক্তিগত বৈধ স্বত্বের বিপরীত। ব্যক্তিগত উৎপাদনে প্রতিযোগিতা থাকলে তা বিকাশেরই সহায়ক হয়। ক্ষেতের বিকেন্দ্রীকরণ স্বাবলম্বনের প্রতীক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় করপাত্রী মহারাজ এ-যুগের নিষ্কলুষ অবতার। সেজন্যই যখন যেখানে ধর্মের ওপর আঘাত আসে, তিনি ব্রহ্ম তেজে জ্বলে ওঠেন : 'অন্যের বিষয় বৈভব ছিনিয়ে নিয়ে ধনী হয়ে যাওয়া খুবই সহজ কিন্তু তা শাস্ত্র বিরোধী। কারণ এখানে সম্পদশালীর ঘরে জন্ম নেওয়াটা পূর্বজন্মের যোগ, তপস্যা, সুকৃতির ফল।'

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।'

'ভূমির ওপরে সকলেরই সমান অধিকার, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ঈশ্বর-নির্মিত ভূমির ওপরে ঈশ্বরেরই সর্বৈব অধিকার ছিল। দানবরাজ বলির পত্নী বিধ্যাবলি বামনাবতার ভগবানকে বলেছিল যে ঈশ্বর তাঁর ক্রীড়াঙ্গন হিসেবে বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা একে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করতে শুরু করেছে। ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হলেন ব্রহ্মা, চন্দ্র, মনু ইত্যাদি। সমাজে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেলে যে মাৎস্যন্যায় উপস্থিত হয় তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জনসাধারণই মানুষকে শাসকপদে বরণ করে। তারপর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের মালিক হতে থাকে। সে সমস্ত বস্তু প্রকৃতি বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, তার মালিকানা সমগ্র জনগণের, এটা কোনো মতেই মানা যায় না। একজন স্ত্রীর জন্ম প্রকৃতি থেকেই, তথাপি তার ওপর মাতাপিতারই স্বাভাবিক স্বত্ব থাকে।...ভূমির ওপরে বিচরণ করে এমন সমস্ত প্রাণীরই জীবন ধারণের, চলাফেরার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার এবং অবসর নিয়ে বিশ্রাম নেবার অধিকার সর্বকালেই ছিল এবং আজও আছে। ভূমিপতিরা সীমিতভাবেই তাঁদের ভূমি থেকে অন্যদের কিছু কিছু ভূমি দান করেছেন। এ থেকেই ভূমিকর প্রদান করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ-সমস্ত ব্যবস্থাই একদিন হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই কৃষির উচ্চস্তরের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এবং এ প্রথা বজায় রেখে, ব্যক্তিগত ভূমি অপহরণ না করে আগামী দিনেও কৃষিতে আরো অনেক উচ্চতম প্রগতি আসা সম্ভব।'

করপাত্রী মহারাজ একটু বিলম্ব করে ফেলেছেন। তাঁর এই ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিচয় আরো কিছুকাল আগে দিলে, দেশীয় রাজ্যগুলি বিলোপ হতো না, আর জমিদারি প্রথারও উচ্ছেদ ঘটত না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঈশ্বরের বিধান

করপাত্রী মহারাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ঈশ্বর বিশ্বাস এই দুটি বিষয়কে পরস্পরের পরিপূরক মনে করেন। বোধহয় সে জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। শারীরিক অথবা মানসিক শ্রমে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা কোনো কমিউনিস্টরাই করে না। তবে সম্পত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আরো সম্পত্তি বৃদ্ধি করা, সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা কিংবা যা ঘটছে, তা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে জনসাধারণের ওপর চলে আসা দীর্ঘদিনের শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা হলে, কৃষক শ্রমিকেরাও সেই ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ মনে করবে। মিথ্যাকে আত্মস্থ করার সবচেয়ে বেশি শক্তি আছে ধর্মের মধ্যে, এটা আর কারো অজানা নেই। সেজন্যই ধনিক-বণিকের দল করপাত্রী মহারাজের 'নব বাইবেল' থেকে যদি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় খুঁজে পায় তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উদাহরণ স্বরূপ : 'মার্কসের মতে পরস্ব অপহরণ ন্যায়।'

মার্কস, ঈশ্বরের নামে সৃষ্ট 'পরস্বের' অধিকারী কেবল শোষকের দল, একথা স্বীকার করেন না। বস্তুর অধিকার তারই সর্বাগ্রে, যে এর উৎপাদন করে। তস্করের কাছ থেকে উদ্ধার করে কোনো বস্তু প্রকৃত অধিকারীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়াটা কোনো অনুচিত কাজ নয়।

তবু করপাত্রী মহারাজ বাহু আস্ফোলিত করে বলছেন : 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সিদ্ধান্তকে শোষণের সিদ্ধান্ত বলা অনুচিত। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' ...বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য...বহুমতের সিদ্ধান্ত সে তো এক অসম্ভব ব্যাপার।'

'...বিস্তৃত মন্বন্তর, যুগ, কল্প ইত্যাদি মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচশো কি হাজার বছরের কোনো বিশেষ মূল্য নেই।...অতএব কিছু ব্যক্তি অথবা কিছু সভাসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করা চলে না। ইতিহাসের ভিত্তিতেও কোনো সিদ্ধান্ত নির্ণীত হতে পারে না।... যখন শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা, দায়, বিজয়, ক্রয় ইত্যাদি মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি-সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত অধিকার বৈধ বলে স্বীকৃত, তখন কিছু লোকের আপত্তিতে কিংবা প্রস্তাবে এই ব্যবস্থার রদবদল কিভাবে সম্ভব ?'

মহারাজের যুক্তির দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তবে অসুবিধা এই যে উক্ত ব্যবস্থার সমর্থন যদি কোটি কোটি বছর আগে লুপ্ত হওয়া ঋষি-মহর্ষিরা করেও থাকেন, আজকের জনতা কিন্তু ওই সমস্ত যুক্তিকে প্রলাপোক্তি বলেই মনে করবে।

এবার দেখা যাক, শোষক শ্রেণী এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে মহারাজ করপাত্রীর কি মতামত : 'যেহেতু ধনীদের কোনো কিছুরই অভাব নেই, অতএব অন্যের বস্তু অপহরণেরও তাদের প্রয়োজন নেই। যেমন অনেক দরিদ্র ব্যক্তি সদাচারী হয়,তেমন ধনীদের মধ্যেও বহু সদাচারী আছেন। সে জন্যই ধনবান বলবান মাত্রই শোষক এ রকম সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। কোটিপতির চেয়ে অর্বুদপতি প্রবল, তাহলে অর্বুদপতি শোষক আর কোটিপতি শোষিত বলে ধরে নিতে হয়। এভাবে কোটিপতি শোষক এবং লক্ষপতি শোষিত, লক্ষপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা সহস্রপতি শোষিত আবার তার দ্বারা শতপতি শোষিত। এভাবে চলতে থাকলে তো এক টাকার মালিকের সঙ্গে এক কপর্দকের মালিকেরও শোষক শোষিতের সম্পর্ক ধরে নিতে হবে।'

যদিও প্রাচীন মীমাংসাকার জৈমিনি ধ্যান-ধারণায় প্রতিক্রিয়াপন্থীই ছিলেন, তবুও তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে —যেহেতু ভূমিতে সকলেরই অধিকার আছে, অতএব তার দান-খয়রাত অসিদ্ধ। কিন্তু করপাত্রী মহারাজ এসব অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তে কিছু চুনকাম করে নিতে উদ্যোগী হয়েছেন : 'ন ভূমির্দেয়া স্যাৎ সর্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ।'

'অর্থাৎ রাজপথ, চত্বর, দেবালয়াদি স্থান সহ অখণ্ড ভূমির দান সঙ্গত নয়, কারণ তা সর্বসাধারণের। এখানে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি এই কটি কথার ওপরে ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে —জমি সমাজের কোনো ব্যক্তির নয়, অতএব তার দানও সিদ্ধ নয়। কিন্তু পূর্বাপর বিচার করলে দেখা যাবে এটা ভুল সিদ্ধান্ত।'

সন্ত বিনোবা পদযাত্রা করে গ্রামে গ্রামে এই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছেন যে ভূমি সকলের। নিজেদের মিথ্যা স্বত্ব ত্যাগ করে ভূদান কর, জমি একক ব্যক্তিসত্তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে সামুদায়িক রূপ গ্রহণ করুক। কিন্তু বিনোবাজীকে সন্ত স্বীকার করতে করপাত্রী মহারাজের বয়েই গেছে, বিশেষত এবিষয়ে তিনি যখন প্রাচীন জৈমিনির সঙ্গেই একহাত লড়ে যাবার জন্য তৈরি।

কোটিপতির অর্বুদপতি হবার পূর্বজন্মের কর্মফল। আর পূর্বজন্মের পুণ্যফলেই তাদের এমন শুভবুদ্ধি জন্মায় যে মুন্দ্রা-কাণ্ড (পঞ্চাশের দশকের ভারতে সংঘটিত আর্থিক কেলেঙ্কারী, যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন শিল্পপতি হরিদাস মুন্দ্রা —অনুঃ) অথবা ওই জাতীয় অন্যান্য ঘটনা ঘটাতে পারে। এজন্যই বোধ হয় মহারাজ নিবেদন করছেন : 'ধৈর্য ধরে—কোটিপতি, অর্বুদপতি, সর্বভূমিপতি হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং সেই মতো চেষ্টা করা এবং সাফল্য লাভ করার মধ্যে কারো আপত্তি থাকার কোনো কারণ নেই।'

মহারাজ অবশ্য বর্তমান সমাজের আইনের পথকে বৈধ পথ হিসেবে মানতে নারাজ। তাঁর কাছে বৈধপথ হচ্ছে একমাত্র সেটাই, যা স্মৃতি এবং শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।

ধনিক শ্রেণী শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে যে অতিরিক্ত মুনাফা লোটে সে সম্বন্ধে শ্রীমুখ নিসৃত বাণী হলো : 'অতিরিক্ত আয়কে অবৈধ বা অনুচিত বলা যায় না।...উদ্যোগপতিরাই এই অতিরিক্ত আয়ে হকদার, কারণ নতুন যন্ত্রপাতি কেনা, গবেষণা ইত্যাদির ব্যবস্থাও তাদেরকেই করতে হয়।'

এরপর করপাত্রী স্বামীর আশংকা যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার না থাকলে সমাজে অনর্থ ঘটবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্যক্তিগত ভূমি ও সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ হয়ে গেলে সমাজ চিরকালের জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যাবে। নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের রক্ষায় কিংবা তার বিকাশের জন্য কেউ কিছু করতে পারবে না। মুষ্টিমেয় স্বৈরাচারী কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্তই আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর কোনো ভাবনাই করতে হবে না শ্রমিকদের দারিদ্র্য মোচনের জন্য, কারণ, 'যারা শাসন ক্ষমতায় থাকে তারা কখনোই দরিদ্র থাকে না।'

মহারাজের এবার একেবারেই বিবস্ত্র অবস্থা। অবশ্য নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই এতে হয়ত তিনি লজ্জিত হবেনও না। মজুরদের গরীব না থাকাটা তাঁকে বড়ই পীড়া দেয়; তাই তিনি বলছেন : 'ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবী, ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তারই উত্তরাধিকার বর্তেছে তাঁর সন্তানদের মধ্যে। এর মধ্যে সমস্ত প্রাণীই বর্তমান। কিন্তু প্রধানত দায় থেকে, তারপর জয়, ক্রয়, দান, পুরস্কার ইত্যাদি রূপে ভূ-সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজ নিজ কর্মফল অনুসারেই সুখ, দুঃখ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধ নির্ণীত হয়।

'ভারতীয় ধার্মিক ও রাজনৈতিক শাস্ত্রসমূহে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বৈধ বলে স্বীকার করা হয়েছে। মনু ইত্যাদি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, মিতাক্ষরা রচিত নিবন্ধাবলীতে আমরা পাই যে পিতা-পিতামহের সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্রের অধিকার জন্মগত। দায় হিসেবে প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্বাভাবিকভাবেই পুত্র পৌত্রাদিতে বর্তায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, মিত্রজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত, বিজয় দ্বারা লব্ধ, শ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থে ক্রীত, পুরস্কার কিংবা দান হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি বৈধ সম্পত্তি। এগুলি ব্যতিরেকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সম্পত্তির আয় থেকে অর্জিত অর্থের ওপরে প্রাপ্ত সুদও বৈধ সম্পত্তি।'

'সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্মযোগশ্চ সত্যপতিগ্রহ এব চ।...'

'যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর পর্ণকুটির এবং তাঁর স্ত্রীর স্বামিত্বের অধিকারী হয়, তাহলে কারো ভূস্বামী হওয়াটাও কোনো অকল্পনীয় কিছু নয়।'

'এক কপর্দকের-অধিকারী, এক টাকার-অধিকারী এবং এভাবে শতপতি, সহস্রপতি, লক্ষপতি, ক্রোড়পতিদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র শোষক এবং শোষিতের, এটা নেহাতই কল্পনা। কেবলমাত্র শোষিতকে বজায় রেখে বাকি সমস্ত শোষকের উন্মূলন বাস্তবে সম্ভব নয়, কারণ কে যে সর্বশেষ পর্যায়ের শোষিত তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন কাজ। সমাজে সবাই থাকবে এবং কেউ কারো শোষক হবে না, পোষক হবে। বাঘে ছাগে একই ঘাটে জলপান করবে। বাঘ ও ছাগ উভয়েরই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সেই অধিকার নিয়ে পরস্পরের পোষক হয়ে জীবিত থাকুক, খাদ্য খাদক হয়ে নয়।'

পুঁজিপতি কোটিপতি ধনিক বণিকদের স্বার্থে মহারাজ কতদূর যেতে প্রস্তুত? মহারাজের উপযুক্ত বাণীর পর শেঠ-বণিকেরা যে তাঁকে মাথায় করে রাখবে তাতে আর আশ্চর্যের কি?

দরিদ্র মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভাঙিয়ে এই ধনিক-বণিকের দল এবং তাদের মোসাহেব করপাত্রী মহারাজরা কিভাবে চলেন তার এক ঝলক নমুনা দেখা যাক:

'প্রায়শই দরিদ্র শ্রমিক ঈশ্বরবাদী এবং ধার্মিক হয়ে থাকে। ভারতের শতকরা একশো ভাগ শ্রমিকই আস্তিক এবং ধার্মিক। এরা রামায়ণ, ভাগবত এবং গীতাকে মান্য করে; সত্যনারায়ণের কথকতা শোনে, কীর্তন গায়; বোনাস, বেতনবৃদ্ধি বিভিন্ন ভাতাবৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে কমিউনিস্টরাই এদের আন্দোলনে সামিল করে। যদি তারা জানতে পারে যে, কমিউনিস্টরা শাস্ত্র, ঈশ্বর, ধর্ম কোনো কিছুকেই মান্য করে না, তাহলে ভুলেও শ্রমিকেরা এদের খপ্পরে পড়বে না।'

করপাত্রী মহারাজের রামরাজ্যে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ধারণাটি এ রকম: 'পুঁজি, ভূমি, খনি ইত্যাদি সর্বসাধারণের নয়। এগুলির মালিকানা তাদেরই যারা বংশ পরম্পরায় তার স্বত্ব ভোগ করে আসছে, অথবা তাদের যারা জয়, ক্রয় কিংবা পুরস্কার হিসেবে এর স্বত্বাধিকারী।'

'তথাকথিত জাতীয়করণের ফলে ভূ-সম্পত্তি, কল-কারখানা, বিভিন্ন অন্যান্য উদ্যোগ সবই সরকারের অধীনে চলে যায়, আর ব্যক্তি শাসন যন্ত্রের সাধারণ নাটবল্টুতে পরিণত হয়।'

'সমস্ত সম্পদেরই জাতীয়করণ শাস্ত্র এবং ধর্ম বিরুদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু, সাধারণভাবে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, এর ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু আর থাকে না, তাতে ব্যক্তির বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ধ্বংস হওয়ার অর্থই দেশে একনায়কতন্ত্রী শাসন কায়েম হওয়া।'

তাহলে ধরে নিতে হবে যে, টাটা বিড়লার মতো জবরদস্ত পুঁজিপতিদের তাঁবে, বিনা প্রতিবাদে, মরতে মরতেও কাজ করার মধ্যেই শ্রমিকের স্বাধীনতা এবং কল্যাণ নিহিত আছে। পুঁজিপতিদের হাতের ক্রীড়নক আমলাতন্ত্রের শাসন কি নিরঙ্কুশ নয়? এই 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' ন্যায় সম্পর্কে মহারাজ কি বলবেন? তিনি তো ইতিমধ্যেই পুঁজিপতিদের স্বৈরাচারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন: 'বস্তুত অতি সাম্য এবং অতি অসাম্য দুটো ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ। হাতের সব আঙুল সমান হলেও অসুবিধা, আবার স্বাভাবিক অসমানতার চেয়ে বেশি অসমান হলেও অবস্থা তদ্রূপ। হাত, পা, উদর সব সমান হওয়াটা যেমন ঠিক নয়, তেমনই হাত-পা কৃশ, কিন্তু উদর স্ফীত, তাহলে আমরা অনুরূপ ব্যক্তিকে ব্যাধি-গ্রস্ত বলে ধরে নিই। সেজন্যই প্রয়োজন যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণ রাখা এবং অবকাশেরও সুযোগ রাখা। কেন্দ্রীকরণ বা জাতীয়করণের চেয়ে বিকেন্দ্রীকরণ সর্বদাই শ্রেয়। এর ফলে সর্বপ্রথমে সম্পত্তি সম্পর্কে পরম্পরাগত ঐশ্বরিক বিধানের মর্যাদা রক্ষিত হয়। 'সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্যা' অনুসারে দায়, জয়, ক্রয় এবং পুরস্কারে প্রাপ্ত সম্পত্তি বৈধতা নিশ্চিত হয়,··· তাছাড়া সবই রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেলে মানুষ যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে। কাজকর্মে হৃদয়ের যোগ থাকে না। ফলে তার বিকাশও আকাঙ্ক্ষিতভাবে হয় না।'

মজুরদের জন্য এক কণা এবং শেঠ-বণিকদের জন্য মণ মণ, করপাত্রী মহারাজের বিতরণ ব্যবস্থায় এই হলো সিদ্ধান্ত। এর জন্য তিনি জোর সওয়াল করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তার জন্য হাতি এবং পিঁপড়ের খাদ্যের পরিমাণের তুলনা বেশ কয়েক দফা আমাদের শুনিয়েছেন।

তবে এক জায়গায় না জানি কিভাবে মহারাজ কৃষিক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করে ফেলেছেন।

'সংযুক্তভাবে যারা কৃষিকর্ম করে, তাদের মধ্যেও যাদের লাঙল, বলদ, বীজ, সার, মজুর ইত্যাদির পরিমাণ আনুপাতিক হারে বেশি কিংবা কম, উৎপাদিত ফসলের বণ্টনও সম অনুপাতেই হওয়া উচিত।'

'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এক পবিত্র অধিকার' এই সিদ্ধান্তের ঔচিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে শেঠ-বণিকদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হবে না, বোধহয় সেজন্যই এই বিষয়টিতে মহারাজ খুবই জোর দিয়েছেন। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঈশ্বরের বিধান' শুধু বলেই উনি থেমে থাকতে রাজী নন, এটা পূর্বজন্মের কর্মফলের উপরেও নির্ভরশীল, এ তথ্যও আমাদের জানিয়ে রেখেছেন।

কর্মানুসারে ধনী গরীব

কোনো এক পরম কুশলী ব্যক্তি এই কর্ম এবং পুনর্জন্মের তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করেছিলেন সন্দেহ নেই। এই তত্ত্বের আড়ালে আর্থিক বৈষম্যের বিষয়টিকে অনায়াসে ধামাচাপা দেওয়া যায়। সেইজন্যই করপাত্রী মহারাজও এই তত্ত্বের সমর্থনে জানপ্রাণ সমর্পন করে বসে আছেন।

'ধর্ম-অধর্মের বৈচিত্র্যের কারণেই, জন্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।'

'সুখ, দুঃখ সবই নির্ভর করে ধর্মের ওপরে।'

'নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী, প্রবল, দুর্বল, বুদ্ধিমান, নির্বোধ রূপে মানুষের জন্ম হয়।···রামরাজ্যে বাঘ ও ছাগ একই সঙ্গে জলপান করত।'

'সমস্ত মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ছিল। স্বধর্ম এবং শ্রুতি-নীতি নিরন্তর প্রবাহিত ছিল।'

'কেউ কারো বৈরী ছিল না—রামের প্রতাপে বৈষম্যভাব লোপ পেয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অরণ্যে কাননে গাছপালা ফুলেফলে পরিপূর্ণ ছিল। ঐরাবত এবং পঞ্চাননও একই সঙ্গে বাস করতেন।'

'ইঁদুর বেড়ালও ছিল একে ওপরের হিত চিন্তক, উপকারী এবং পোষক।'

পৃথিবীতে, বিশেষত ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশি মানুষ অসহ্য দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, কারণ মুষ্টিমেয় ধনিক বণিক গোষ্ঠী দরিদ্র শ্রমজীবী এবং কৃষকদের উৎপাদন আত্মসাৎ করে চলেছে। কিন্তু করপাত্রী মহারাজের চোখে এই কারণগুলি কিছুতেই ধরা পড়ছে না। প্রকৃত শোষকের দিক থেকে দৃষ্টি অন্যত্র যাতে সরে যায়, সেই উদ্দেশ্যে কর্ম-ফলের দোহাই পেড়েই চলেছেন: 'কালান্তর এবং জন্মান্তরের কর্মের বৈচিত্র্যের ওপরে নির্ভর করে বর্তমান জন্মের ফলাফলের ভেদাভেদ। পূর্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ওপরেই এ জন্মে বৈধ ভু-সম্পত্তি লাভ ইত্যাদি ঘটে।'

'শাস্ত্রানুসারে···নিকৃষ্ট কর্মের ফল হিসেবেই কিছু মানুষ বর্তমান জন্মে পর্যাপ্ত বৈধ ভূমি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়।'

কংগ্রেসী সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি প্রথার উন্মূলন করেছেন, কিন্তু ধর্মপ্রাণ করপাত্রী একে ঘোরতর ধর্মবিরুদ্ধ মনে করেন: 'জমিদার কর্তৃক কৃষকের ভূমি হরণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈধতার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত। ব্যক্তিগত-ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকে, তা উদ্যোগের বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়। সমাজ্যবাদীরা সে জন্যই সমস্ত বৃহৎ উদ্যোগকে বিকেন্দ্রিত করার সপক্ষে।'

এখানে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য, ওই উদ্যোগগুলিকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া এবং যা তাদের হাতে আছে তাকে চিরস্থায়ী করা। এই যুক্তি অনুসারে জেসপ কোম্পানীকে মুন্দ্রাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়াটা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ হয়েছিল।

স্বামিত্বং চৈব দাতৃত্বং ধনিকত্বং তপঃ ফলম্।
এনসঃ ফলমর্থিত্বং দাসত্বং চ দরিদ্রতা।'

(শুক্র নীতিসারং, পৃ. ৩৬৬)

করপাত্রী মহারাজের মতে তপস্যার ফলে ধনী, প্রভু এবং দাতাগণ জন্ম-গ্রহণ করেছেন, আর পাপের ফলেই জন্ম হয়েছে ভিক্ষুক, দাস এবং দরিদ্রদের। যদি এটাই শাস্ত্রসম্মত হয়ে থাকে, তাহলে এই সনাতনী বিধানের পরিবর্তন ঘটানো অত্যন্ত অন্যায় এবং নিন্দনীয় কাজ হবে।

অপরের বিষয় সম্পদ কেড়ে নিয়ে সুখী হওয়া খুব সহজ; কিন্তু তা হিত-কারী নয়।'

শাস্ত্র বলছে: 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে।' (গীতা)
(অর্থাৎ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ সদাচারপরায়ণ ধনীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জগতের বৈচিত্র্যের (ধনী-দরিদ্র) মূলে আছে কর্মফল। কর্মফলই বিধান দেয় পিঁপড়ের জন্য এককণা, হাতীর জন্য একমণ।'

'রামরাজ্যের দৃষ্টিতে কর্মফলানুসারে ফলাফলের সিদ্ধান্তের যে প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত আছে তা সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতাশূন্য।'

এতদ্বারা নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হয় যে কর্ম এবং পুনর্জন্ম—এই হাতিয়ার এই পৃথিবীকে নরকে পরিণত করতে রামবাণের কাজ দিচ্ছে।

শেঠ-বণিকেরাই প্রকৃত প্রভু

মার্কসবাদীরা পুঁজিপতিদের প্রাধান্য খর্ব করে উৎপাদনের সমস্ত কৃতিত্ব মানসিক এবং কায়িক শ্রমজীবীদের দিতে চায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধিকারীদের একেবারেই না-পসন্দ। তাই এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য : 'আধুনিক যান্ত্রিকীকরণের যুগে উৎপাদনের জন্য পুঁজি এবং শ্রম উভয়ের প্রয়োজনীয়তাই অনস্বীকার্য। বিনা পুঁজিতে শ্রমজীবীরাও কোনো কিছু উৎপাদন করতে অক্ষম ···পুঁজিপতিদেরও উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে শ্রমের সাহায্য চাই। অতঃপর পুঁজিপতিরা মূল্য দিয়ে শ্রমশক্তি ক্রয় করে। সেজন্যই তারা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত মজুরী দিয়েই আয়ের হকদার হয়।'

'এভাবেই প্রমাণিত হয়, 'সর্ব কিছুতেই সকলের অধিকার' এই ধারণা কত ভ্রান্ত। যোগ্যতা এবং প্রয়োজনানুসারে 'পিঁপড়ের এককণা, হাতীর একমণ' তত্ত্ব প্রয়োগ করেই কর্ম, মূল্য, বিশ্রাম সকলেই পেতে পারে। এভাবেই বিশিষ্ট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিদের মতো মান, স্থান, রুজি-রোজগার ইত্যাদির পথ সকলের জন্যই উন্মুখ থাকা উচিত।'

'উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের কৃতিত্ব পুঁজিপতিদেরই বা দেওয়া হবে না কেন?'

করপাত্রী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বচন, বেদশাস্ত্রের চেয়ে কম মহত্ত্বের দাবি রাখে না, কারণ পৌরুষেয় অপৌরুষেয় সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রই যখন তাঁর মতের সমর্থক।

'বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ···লভ্যাংশে অধিকারী একমাত্র মালিক' এই মত মেনে নিয়েছেন। ভূমিকর সম্পর্কেও ঋষিদের মতামত অনুরূপ, যদিও মার্কসবাদীরা এসব স্বীকার করে না। তারা প্রাচীন ইতিহাসকে প্রামাণ্য বলে মানে না, কিন্তু আধুনিক, মনগড়া ইতিহাসে তাদের অগাধ আস্থা'।

মহারাজের সমস্ত বাণীর ওপরে টিপ্পনী কেটে লাভ নেই। যেখানে একদিকে স্বার্থান্ধ রক্তচোষা জোঁকের দল এবং তাদের অনুচরেরা, যারা মানুষকে সদাই 'সত্যবচন' শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, যাতে তারের প্রভুরা অবাধে বিচরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে, আর অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী শোষিত মানুষের দল। যারা প্রভুদের শোষণের নগ্ন রূপকে চিনে নিতে কোনো ক্রমেই ভুল করে না।

মার্কসের মতে, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির ব্যয় দেখিয়ে আর শ্রমিকের উদ্বৃত্ত উৎপাদন মূল্যের ন্যূনতম অংশ তাদের দিয়ে বাকি সমস্ত অংশই পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। এর উত্তরে করপাত্রী মহারাজ বলছেন: 'লাভ কিংবা মুনাফা শুধুমাত্র পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত হয় না। এটা অর্জিত হয় শ্রম ও কাঁচা মালের সমন্বয়ে। যেভাবে উচিত মূল্য দিয়ে পুঁজিপতিরা কাঁচামাল কেনে, অনুরূপভাবেই উচিত মূল্য দিয়ে তারা শ্রমও কেনে। এই দুই বস্তু ক্রয়ে পুঁজি-পতিকে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে তাকে পেতেই হবে। এই বেশি পরিমাণ অর্থই মুনাফা রূপে পুঁজিপতির কাছে আসে এবং তাতে তারই বৈধ অধিকার। কাঁচা-মালের মূল্য বাদ দিয়ে বাকি সবটাই শ্রমের মূল্য, একথা বলাটা একেবারেই ভুল। মজুরী কিংবা বেতন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এই যে, প্রভু আর ভৃত্য পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে পারিশ্রমিক ধার্য করবে, সেটাই ন্যায্য মজুরী বা বেতন।'

'ভৃত্যায় বেতনং দদ্যাৎ কর্মস্বামী যথা কৃতম্।
আদৌ মধ্যোবসানে কর্মণো যদ্ বিনিশ্চিতম্॥'

(নারদ স্মৃতি)

'যদি সমস্ত মুনাফাই শ্রমিকের প্রাপ্য হয়, তাতে পুঁজিপতিদের কোনো অংশই না থাকে, তাহলে পুঁজিপতিরা নিশ্চয়ই উন্মাদ নয় যে তারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবে? কেন তারা গাঁটের কড়ি খরচ করে উদ্যোগ স্থাপন করে ঝুঁকি নিতে যাবে? এর চেয়ে বরং তারা নিজেদের পুঁজি ভেঙেই বসে বসে খাবে এবং দূর থেকে মজা দেখবে যে, কিভাবে বিনা পুঁজিতে শ্রমিকেরা শুধু মাত্র শ্রমের সাহায্যে উৎপাদন এবং উপার্জন অব্যাহত রাখে।'

'পুঁজিপতিরা যেমন দাম দিয়ে মেসিনপত্র কেনে, কারখানার ইমারত তৈরি করে, কাঁচামাল সংগ্রহ করে, শ্রমিকের শ্রমও সংগৃহীত হয় সেভাবেই। অতএব এই প্রক্রিয়ার ফলে যে মুনাফা অর্জিত হয়, তাতে ন্যায়ত পুঁজিপতিদেরই অধিকার।'

কলিযুগে সনাতন ধর্মের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ নিদারুণভাবে অবহেলিত হচ্ছে দেখে মহারাজ যারপরনাই রুষ্ট।

শুধুমাত্র মজুরীতে সন্তুষ্ট থাকব না, মজুরী যে দেয় তার সমস্ত সম্পদের মালিক আমি হয়ে যাব, এরকম ভাবনা, দস্যু তস্করের দানবীয় মনোভাব, ন্যায় বিচার নয়। একটা হিংস্র নেকড়ে কিংবা কুকুরও এ রকম ভাবে না যে, তাকে রোজ যিনি আহার যোগান, তাঁর ধ্বংস হোক।

'যেখানে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিপতিদের দ্বারা সমাজের এত প্রগতি হয়েছে, এত লাভ হয়েছে, সেই ব্যবস্থার ইতি করে দেওয়া কি মানবতা?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরতাল ধর্মঘট ইত্যাদি আন্দোলন করে মালিকদের বিব্রত করা একান্তই ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বিরোধী কাজ। অতএব করপাত্রী মহারাজ শ্রমিকদের একই হুমকি দিয়ে শিক্ষা দিতে চাইছেন : 'শুধুমাত্র লাঙল চালানোটাই কাজ নয়। একটা বিরাট উদ্যোগের কর্মকাণ্ড পরিচালনার কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ।'

সম্প্রতি মুন্দ্রা এবং ডালমিয়াকে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখেছি। অন্যের শ্রমের বিনিময়ে বিলাসে জীবন কাটানো আর ফাটকাবাজিতে কোটি কোটি টাকার হেরফের করা। এ কী সহজ কাজ ?

উনি আরো বলছেন : 'যে আপন কর্তব্য পালন করে চলে, তাকে শোষক বলা যেতে পারে না। শ্রমের মালিকরাই যদি লভ্যাংশের সবটুকু দাবি করে, তবে উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের মালিকেরাও সেই দাবি করবে না কেন ? লভ্যাংশে তাদের অধিকারকেও স্বীকার করে নিতে হয়।'

শ্রমিকদের দাবি মিথ্যা

যখন মুনাফায় পুঁজিপতিদের অধিকার ধর্ম এবং ঈশ্বর দ্বারা নির্দিষ্ট এবং স্বীকৃত, অথচ বর্তমানের শ্রমিকেরা তাতে নিজেদের অধিকার দাবি করছে, এ অবস্থায় করপাত্রী মহারাজের মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে বিচলিত হয়ে উঠবেন, তাতে আর সন্দেহ কি ? তাই তো তিনি বলছেন : 'পুরাণে এ রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে ভৃত্য প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তৎপর হয়েছে। যার নুন তারা খেত, তাদের তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকত, কৃতজ্ঞ থাকত। নেমকহারামিকে তারা ঘৃণ্য পাপ বলে বিবেচনা করত।'

'হরতাল, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদির সাহায্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে শ্রমিক-দের ভাঙচুর করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।'

'উৎপাদন সামগ্রীর ওপরে যদি মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার বৈধ হয়ে থাকে, তবে তার ধ্বংসসাধন করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে কিছু স্বৈরতন্ত্রীর হাতে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা চলে যাওয়া কখনোই কাম্য নয়, এবং উচিতও নয়।'

'বস্তুত, যে শ্রমিকের দল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে দিয়েছে, তাঁদের কি অধিকার আছে উৎপাদন সামগ্রীর মালিকানা দাবি করার ? 'শাস্ত্র ফলং প্রয়োক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ।' (মীমাংসা-জৈমিনি)

করপাত্রী মহারাজ মীমাংসাসূত্রের উল্লেখ করে বলছেন যে, যজ্ঞের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং প্রক্রিয়াই ঋত্বিক-পুরোহিতদের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু যজ্ঞের ফলে তাদের কোনো অধিকার থাকে না, কারণ এ কাজের জন্য তাঁদের দানদক্ষিণা দেওয়া হয়। পুঁজিপতি শ্রমিকদের সম্বন্ধেও এই একই বিধান প্রযোজ্য।

'মুনাফায় অংশীদারদের অংশ থাকতে পারে, কিন্তু ভৃত্যদের নয়, কারণ তারা অগ্রিম মজুরী ভোগ করে থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে (পুঁজিপতি) উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই তার ফল লাভেরও অধিকারী, তারই ফল পাওয়াও উচিত। তারপর কারোর উন্নতি দেখে অন্য কারোর যদি শিরঃপীড়া শুরু হয়। তাকে একমাত্র ঈর্ষা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে ?'

শ্রমিকদের ধৃষ্টতাটা একবার দেখুন : 'যারা বেকারীর জ্বালায় পরিশ্রান্ত হয়ে যে-কোনো উপায়ে একটা চাকরি পাবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছিল, চাকরি পাওয়ার পরেই তাদের রূপ গেলো বদলে। বসবার জায়গা পেল তো শোবার জায়গা চাই। মালিকপক্ষকে সরিয়ে নিজেরাই মালিক হয়ে বসতে চায়।'

শ্রমিকের শ্রমের ফল তাঁর মজুরী।

পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের সমন্বয়

করপাত্রী মহারাজ এ যুগেও বাঘ ও ছাগকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে চাইছেন। পিপীলিকাতুল্য শ্রমিকদের জন্য কণা মাত্র রেখে তিনি পুঁজিপতিদের জন্য কয়েক মণ বরাদ্দ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিচারে সেই খাদ্যের কণামাত্রেরও অভাবে লাখো লাখো শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত্যুকে বিধির বিধান জেনে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ এ তাঁদের পূর্বজন্মের কর্মফল।

বাঘ ও ছাগকে এক ঘাটে জল পান করানোর চেষ্টায় কিন্তু তাঁর কোনো ত্রুটি নেই। তিনি এর উপায়ও বাতলেছেন : 'শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী বিদ্বেষ প্রভৃতি ছড়িয়ে শ্রেণীকেই ধ্বংস করার চেষ্টা কখনোই আদর্শ হতে পারে না।'

জানি না, শ্রমিক বা অন্য কারোর জন্য মহাভারত থেকে রন্তিদেবের নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করেছেন :

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং না পুনর্ভবম্
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনাং আর্তিনাশনম্ ॥'

(অর্থাৎ—আমি কিন্তু রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিও চাই না। আমি চাই দুঃখতপ্ত প্রাণিকুলের দুঃখনাশ।)

শ্রেণীসংঘর্ষের প্রবক্তা মার্কসের অনুগামীদের প্রতি তাঁর আহ্বান : 'অধ্যাত্মবাদী···রামরাজ্য···বস্তুবাদী সমাজবাদ, সাম্যবাদের সঙ্গে কোনো রকম সমন্বয় হওয়াই অসম্ভব।'

'শ্রমিক মালিকের সহবস্থান হতেই পারে। অতএব মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যানুযায়ী সমাজে সর্বদাই ইঁদুর-বেড়ালের ঝগড়ার মতো শ্রেণীসংঘর্ষ লেগেই আছে একথা মানার কোনো প্রয়োজন নেই।'

মহারাজ শেঠ-পুঁজিপতিদের সমর্থনে যে উদ্গার ছেড়েছেন, তার সমস্তই ঐশ্বরিক জগৎ এবং শাস্ত্রবচনের মাধ্যমে এই গ্রন্থে প্রকট করেছেন, তার খুব সামান্য অংশই এখানে দেওয়া গেলো। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যই তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

রামরাজ্যবাদ

রাজনীতির অঙ্গনে গান্ধীজীই প্রথম রামরাজ্যের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে রামরাজ্যের মহিমা কীর্তন করে অনেক চৌপদী গেয়েছেন। ধনিক-বণিকদের হিতার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে রামরাজ্য আখ্যা দিয়ে, তার পক্ষে করপাত্রী মহারাজ যথেষ্ট প্রচার করেছেন। অবশেষে সেই নামে একটা রাজনৈতিক দলও তৈরি করে ফেলেছেন। এই দলের প্রার্থীরা বিগত সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামানত খোয়ানোর এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। বহু কষ্টে মাত্র দু-একটি প্রদেশে তাঁর দলের দু-একজন প্রার্থী বিধানসভাতে পৌঁছতে পেরেছেন। যে রাজনৈতিক দল সত্তর ভাগ জনতাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং পদদলিত করে রাখতে চায়, তাদের প্রতি জনতার এহেন ব্যবহারে আশ্চর্যের কি আছে? তবে করপাত্রী মহারাজ হতাশ নন: 'কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।'

(অর্থাৎ—কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা।)

ধর্ম নিয়ন্ত্রিত রাজ্য

করপাত্রী মহারাজের রামরাজ্য হবে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত রামরাজ্য। সেই ধর্ম অনুসারে যদি কোনো শূদ্র বেদ শুনে ফেলে, তাহলে তার কানে গলন্ত সীসা ঢেলে দিতে হবে, আর যদি কেউ বেদ উচ্চারণ করে, তাহলে সেই বেদ উচ্চারণকারী শূদ্রের জিভ কেটে ফেলতে হবে। রামরাজ্যের যেমন একটা সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা দেওয়া গেলো, তেমন এর একটা গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিকও আছে। রামরাজ্যবাদের ব্যাখ্যা দু'ভাবেই করা যায়। তাই শ্রীমহারাজ বলছেন: 'রাম-রাজ্যবাদী জড় এবং চেতন উভয়কেই আধ্যাত্মিকভাবে সমন্বিত করে। তেমনভাবেই রাজতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র, ব্যক্তি-সমষ্টি, বিত্ত-বিভেদ এবং শ্রম-বিভেদেরও সমন্বয় সাধন করে। এভাবে অধ্যাত্মবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, আরম্ভ থেকে অন্ত পর্যন্ত ধর্ম নিয়ন্ত্রিত, ধর্ম সাপেক্ষ, পক্ষপাতহীন শাসনতন্ত্রই সর্বোচ্চ মানব কল্যাণকারী এবং এই ব্যবস্থাই প্রগতির চরমতম সীমা।'

পক্ষপাতহীন কথাটা ঠিক হবে না কারণ এ রকম শাসনপ্রণালী শতকরা দশজন উচ্চবর্ণের মানুষের হিতেরই রক্ষক মাত্র।

মার্কস বলেছেন, 'মানুষ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম এবং সে এই পরিবর্তন ঘটিয়েও থাকে।'

মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করতে করপাত্রী মহারাজের আপত্তি হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত নয় ; কারণ তিনি নিজেও তো কলিযুগের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে সত্যযুগের ধ্বনি তুলেছেন, সেটাও তো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্যই।

'ধর্ম নিয়ন্ত্রিত রাজ্য এবং ধর্ম নিয়ন্ত্রিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন উভয়ই আপেক্ষিক।'

কিন্তু ধর্ম কি ? এ সম্বন্ধে মহারাজ বলেছেন যে, ধর্ম এমন এক বিষয়, যা কেবল অপৌরুষেয় বেদ, ঋষি প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং মহারাজের ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমেই জানা যায়। তাঁর অভিমত—আর একবার শূদ্র ও অতিশূদ্রদের দাসে পরিণত করা হোক, দাসপ্রথার সপক্ষে প্রচার করা হোক, প্রতি বছর কয়েক লক্ষ বিধবাকে সতী ধর্মের নামে আবার পুড়িয়ে মারা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি।

'এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত যে রাষ্ট্রশক্তি কোনো ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। অন্যথায় উচ্ছৃংখল রাষ্ট্রশক্তি, রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হতে পারে।'

এরপর করপাত্রী মহারাজ ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে তাঁর মতো লোকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন : 'মহাত্মা ব্যক্তিরা ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং অপৌরুষেয় শাস্ত্রগ্রন্থের সমাদর করেন।'

কিন্তু দেশের অসংখ্য কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সমর্থকগণ তাঁর এ ধরনের মতামতকে স্বার্থপর লোকের মিথ্যা আড়ম্বর বলে মনে করে। প্রাচীন বস্তুবাদীরাও বলতেন : 'ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ।' (ভণ্ড ধূর্ত এবং নিশাচরেরাই কেবল তিনটি বেদের কর্তৃত্ব মেনে চলে।)

স্বল্প জ্ঞানী নেতা কিংবা তাদের পরিচালিত সরকার দেশ-কাল-পরিস্থিতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। সেজন্যই তারা অনেক সময়ে নিজেদের মনগড়া নিয়ম তৈরি করে।'

জওহরলাল, পন্থ কিংবা সম্পূর্ণানন্দ সকলেই অজ্ঞ এবং কূপমণ্ডূক। সর্বজ্ঞ একমাত্র শ্রী সহস্রআট করপাত্রী মহারাজ।

'ধর্মনিয়ন্ত্রিত পুঁজিপতিরাই সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটায় এবং কল্যাণ সাধন করে। ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি, পুঁজি ইত্যাদি থাকাও কোনো কিছু অহিতকর নয়।'

ধর্মের এত সুন্দর নিয়ন্ত্রণ কোন হতভাগ্য পুঁজিপতি অস্বীকার করবে ?

'পুরাণ, কোরান, বেদ, বাইবেল, মন্দির মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার প্রত্যেকেরই সম্মান থাকবে। সকলেরই নিজ নিজ পারিবারিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকবে।'

কলিযুগের রামরাজ্যবাদ সত্যি খুব উদার। পুঁজিপতিদের কল্যাণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আর পুঁজিপতিরাও কোরান-পুরাণের ঝগড়াকে দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যেদিন মানুষ ভগিনী-কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করবে সেদিন তার সঙ্গে পশুর আর কোনো তফাত থাকবে না। কমিউনিস্টরাও এতটা করার সাহস দেখাবে না।'

কিন্তু মহারাজ এখানে একটা বড় রকমের ভুল করে বসে আছেন। দক্ষিণ ভারত প্রাচীন রামরাজ্যের বড় সমর্থক। ছুৎমার্গের বিচারে তারা উত্তর ভারতের লোকের কান কাটে। বড় বড় বৈদান্তিক, মীমাংসক, বৈদিক প্রভৃতির জন্ম হয়েছে এখানকার ব্রাহ্মণ কুলে। আজও এখানে লোকে হাজারে হাজারে ভগিনী-কন্যাকে অর্থাৎ ভাগ্নীকে বিয়ে করে, তাদের গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়, এবং ধর্ম, দেশাচার পরম্পরা এই প্রথাকে সমর্থন করে। যদি বিশ্বাস না হয়, মহারাজ স্বয়ং সেখানে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসতে পারেন।

'ধর্ম পরম্পরা অনাদি। অতএব বর্ণাশ্রম প্রথা, পাতিব্রত্য, ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুই অনাদি। বিবাহ প্রথাও অনাদি। শ্বেতকেতুর উপাখ্যানকে বাক্য হিসেবে না ধরে, গুণবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে।'

সব কিছুই অনাদি। সেজন্যই তো দক্ষিণের বৈদিক ব্রাহ্মণ ভগিনী-কন্যা বিবাহ করে। বর্ণাশ্রম ধর্মও অনাদি। অবশ্য এতে কোনো কোনো সনাতনী আপত্তি তুলতে পারেন, কারণ মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন: 'একবর্ণমিদমাসীৎ বিশ্ব'…যুধিষ্ঠির। অর্থাৎ—ওহে যুধিষ্ঠির এই বিশ্বজগৎ একবর্ণ ছিল। পাতিব্রত্য বলতে মহারাজ বোঝেন মেয়েদের আগুনে পুড়ে সতী হওয়া। কিন্তু বৈদিক যুগে এই সতীপ্রথার চলন ছিল না। বেদ-ব্রাহ্মণে এর কোনোই উল্লেখ নেই। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এ প্রথা শকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শকদের থেকেই এটা এদেশে চালু হয়েছিল। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু বিবাহপ্রথার প্রচলন তখনই করেছিল, যখন সে একদিন এক ঋষিকে তার মাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে দেখেছিল। শ্বেতকেতু বাধা দিতে গেলে তার পিতা ঋষি উদ্দালক তাকে বলেন এটাই সনাতন ধর্ম। আর তখনি শ্বেতকেতু প্রতিজ্ঞা করেন, যে একদিন তিনি এই প্রথা রদ করবেন। তারপর থেকেই এক এক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক একজন পুরুষকে বেঁধে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। করপাত্রী মহারাজ সমস্ত ঘটনাকে গুণবাচক দৃষ্টিতে দেখবার নাম করে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তাঁর অর্থ আজকের যুগের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা সে যুগের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার প্রতিবাদ করছে।

'পাশ্চাত্যের রাজতন্ত্র জড়বাদের প্রভাবে ঈশ্বর এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। পরবর্তীকালে পুঁজিপতিরা এসে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। জড়বাদের প্রভাবে সমাজতন্ত্রের অন্ধ অনুগামী ভারত সরকার বিবাহ বিচ্ছেদের আইন তৈরি করে স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দেবার নামে তাদের সর্বনাশ করেছে।'

পাশ্চাত্য রাজতন্ত্র আর পুঁজিপতিদের ওপর মহারাজের দোষারোপ এক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঠিক নয়। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকার আইজেনআওয়ার এবং ডালেসের ব্যাখ্যা যদি শোনা যায় তাহলে দেখা যাবে ধর্মের মহিমা প্রচারে করপাত্রী মহারাজের চেয়েও তাদের নিষ্ঠা এবং আগ্রহ অনেক বেশি। ওরা অবশ্য এখনও তাঁর অমূল্য গ্রন্থ-রত্নটির সন্ধান পায়নি, পেলে এতদিনে তিন হাজারের জায়গায় তিন লক্ষের সংস্করণ হতো। রাজতন্ত্রকে যে অধিকাংশ জায়গা থেকে হঠে যেতে হয়েছে পুঁজিপতিরাই তার জন্য একমাত্র দায়ী নয়, মূলত দায়ী, অন্ধ জনতা। ভারত সরকারও স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া মহারাজের জানা আছে কিনা জানি না, সমস্ত কালের রামরাজত্বেই কিন্তু সত্তর ভাগ জনতার মধ্যে খোলাখুলি বিবাহ বিচ্ছেদের রেওয়াজ ছিল।

করপাত্রী মহারাজ আমাদের দেশের সাধুদের ওপরেও বেশ খড়্গহস্ত। উনি যখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন প্রবেশের বিরোধিতায় আন্দোলন করেছিলেন, তখন সাধুরা যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বেশির ভাগ সাধুরাই ওঁর মতো সংকীর্ণমনা নয়, সেজন্যই তারা মহারাজের গোহত্যা নিরোধক আন্দোলনেও যথেষ্ট মদত দিতে এগিয়ে আসেনি। সেজন্যই তিনি এই সাধুদের ওপরেও একদফা বর্ষণ করেছেন: 'আজকালকার সরকারী সাধু সমাজের গৃহীত প্রস্তাব, সাধুসমাজ গোহত্যা নিবারণী আন্দোলনকে সমর্থন করতে অপারগ কারণ ওই আন্দোলনের পরিচালনাকারীদের মধ্যে অনেক অপরাধীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং এর ফলে গোটা সাধুসমাজই সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে' চোখ খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন প্রবেশ, হিন্দু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রশ্নে সরকারী পণ্ডিতদের নিশ্চুপ থাকাটাও এক বিচিত্র ঘটনা।

সরকারী সাধুসমাজ বলতে মহারাজ বোধহয় কংগ্রেস নেতাদের পরিচালনা এবং সংরক্ষণে গড়ে ওঠা সাধুদের সংগঠনকে বোঝাতে চাইছেন। তবে এটাই ঘটনা, যে তাঁর মতামতের বিরোধিতা শুধুমাত্র সরকারী সাধুরাই নয় অন্যান্য সাধুরাও করেছেন। এমনটি কি হতে পারে না, যেমন কয়েকজন হাতে গোনা দণ্ডী সন্ন্যাসীকে বাদ দিয়ে, অধিকাংশ সাধুরাই বর্ণাশ্রম প্রথাকে শিকেয় তুলে রেখে, বিভিন্ন জাতি বর্ণের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছেন। অনেক সংস্থা আছে যার সংস্থাপকরা শুধু অব্রাহ্মণই নন, এমনকি তাঁদের মধ্যে অনেকে তথাকথিত শূদ্র বা অন্য কোনো অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরা করপাত্রীজীর এই মহান্ ব্যবস্থা থেকে কিবা নিতে পারেন? তাঁর গোহত্যা বিরোধ আন্দোলনকেও লোকে ধোঁকার টাটি মনে করে, না হলে কি সরকারী কি বে-সরকারী, সাধারণভাবে দেশের সমস্ত সাধুরাই প্রায় গোহত্যা বিরোধী। মন্দিরে হরিজন প্রবেশ, হিন্দু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদিকে তাঁরা সামাজিক প্রগতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গ হিসেবে দেখেন। অতএব ওই সম্পর্কে তাঁরা মোটেই চুপ করে নেই, বরং বহু ক্ষেত্রে ওগুলিকে সমর্থন করেছেন।

রাজা দেবতা

বিনা রামে, রামরাজ্য, কিভাবে সম্ভব? সেজন্যই করপাত্রী মহারাজ রাজতন্ত্রকেই আদর্শ শাসন ব্যবস্থা মনে করেন। আজকাল হাজার নয় লাখো লাখো তথাকথিত শূদ্র তপস্যা করে ব্রাহ্মণের কান কাটছে, বলার কেউ নেই। এক শম্বুকের তপস্যায় ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যু হলো। রাজা রামের কাছে অভিযোগ গেলো। রাজা রাম কিন্তু শম্বুককে তপস্যায় বিরত হতে বললেন না, তিনি শম্বুকের মুণ্ডুটাকেই ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন। করপাত্রী মহারাজের আকাঙ্ক্ষিত রামরাজ্যে এ রকম রাজারই প্রয়োজন।

'...ভারতীয় সৃষ্টিতে মাৎস্যন্যায়ের আগে সকলের মধ্যেই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ছিল। সকলেই ছিল ধার্মিক এবং ঈশ্বরবাদী। সকল প্রাণীকেই মনে করা হতো ঈশ্বরের সন্তান। একে অপরের সঙ্গে সমানভাবে স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাবে ব্যবহার করত। তারপর একদা মাৎস্যন্যায় অবস্থা দেখা দিলো। পীড়িত প্রজারা তখন ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণের উপায় প্রার্থনা করল এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যম ইত্যাদি দেবতার গুণাবলী এবং অংশযুক্ত এক রাজা লাভ করল। প্রজারা সেই রাজাকে যথাবিহিত সম্মানে এবং বিভিন্ন উপাচারে স্বাগত জানাল।'

'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।' (মনুস্মৃতি)

অর্থাৎ—এই যে রাজা, ইনি নররূপে বিরাজমান মহান্ দেবতাই বটে।

রাজা না থাকার অর্থ অরাজকতা যা কোনো অবস্থাতেই রামরাজ্যের অনুকূল হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে রাম তো রাজার প্রতিনিধি ছিলেন, সেজন্যই করপাত্রী মহারাজ বলছেন: 'অরাজক রাজ্য নির্বীর্য হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অরাজকতার চেয়ে বেশি আর কোনো পাপ নেই।...'ন হি পাপাত্ পরতরমস্তি কিঞ্চিদরাজকাৎ।' (মহাভারত ; শান্তিপর্ব)

আরো শোনা যাক :

'অরাজকাঃ প্রজা সর্বা বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃষাণ্।'

(মহাভারত ; শান্তিপর্ব)

অর্থাৎ —আমরা শুনেছি অরাজক অবস্থায় সব প্রজা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেমন জলে মাছেরা পরস্পরকে দুর্বল অবস্থায় গিলে খায়।

বস্তুত রামরাজ্যের সমর্থকদের প্রথমেই রাজার অধিষ্ঠান দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল। তাহলে আপনা আপনি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা একটু কঠিন ব্যাপার, তাই মহারাজ কিছুটা চুপ করে আছেন।

রাজ-মহিমা বর্ণনায় তিনি উপনিষদ উদ্ধৃত করেছেন :

'ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥'

অর্থাৎ—আমার শাসিত রাজ্যে চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, এমন কেউ নাই যে যজ্ঞের জন্য অগ্নি-আধান করেনি, কিংবা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেনি। এখানে কোনো স্বচ্ছন্দচারী পুরুষ নাই তাই বেশ্যা থাকবে কোথায় ?

'রামরাজ্য এবং ত্রেতাযুগে যে অবস্থা বর্তমান ছিল। বর্তমানে সে অবস্থা নেই।' কিন্তু বর্ণাশ্রম অনাদি বিষয়, মহারাজ এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনো রাজার রাজত্বে সকলেই যদি আহিতাগ্নি এবং যজ্বা (হোম যজ্ঞ যারা করে) হয়ে থাকে তার অর্থ এই যে শূদ্রেরও যজ্ঞ-হবনের (যজ্ঞে ঘি ঢালার) অধিকার ছিল। তাহলে কিরকম বর্ণাশ্রম ছিল সেটা ? আসলে যে বর্ণাশ্রমের প্রচলন মহারাজ করতে চাইছেন তার উৎস তাঁর মনের মধ্যে নেই তো ? মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধালু শেঠ-বণিকেরা একটু বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে প্রশ্নটা করে দেখতে পারেন।

রামরাজ্যে সাম্য-স্বাধীনতা

'প্রকৃতিগতভাবে সকল প্রাণীই 'অমৃতস্য পুত্র' ঈশ্বরের সন্তান। অতএব সকলের মধ্যেই সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাব স্বাভাবিক।'

করপাত্রী মহারাজের তথাকথিত শূদ্র, অতিশূদ্র এবং স্ত্রীলোকের প্রতি যেমন মনোভাব, তাতে এই সব সাম্য, স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদিকে আবার শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের মতো বাক্য হিসেবে না ধরে হয়ত গুণবাচকভাবে ধরতে হবে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম সমাজে যে বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা এনেছে, মহারাজ তার একজন কট্টর সমর্থক।

'আধ্যাত্মবাদীদের মতানুসারে—মূল কারণ থেকে বিভিন্ন বিচিত্র রকমের সৃষ্টি শক্তিবৈচিত্র্য, বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে ভালোমতো মানানসই।'

অদ্বৈত ব্রহ্ম হচ্ছেন মূল কারণ। করপাত্রী মহারাজ এই বইয়ে সপ্তকার্যবাদের সমর্থন করছেন বলে মনে হয়। অর্থাৎ কার্য ও কারণে পূর্ণতা বজায় থাকে তাহলে শূদ্র আর ব্রাহ্মণে কিসের ভেদ ? বর্ণভেদের সমর্থনে তিনি এখন ব্রহ্মের অদ্ভুত শক্তি কিংবা পূর্বজন্মের কর্মফলের দোহাই দিচ্ছেন। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে যখন আমরা মহারাজের মায়াবাদী দর্শন নিয়ে আলোচনা করব।

করপাত্রী মহারাজ তাঁর বিরোধী মতের সত্য সিদ্ধান্ত থেকে একটা উদাহরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন, কিন্তু সেটিকে বোঝার চেষ্টা আদৌ করেননি। যেমন তিনি লিখছেন: 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা এবং শোষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতেই পুঁজিবাদী দার্শনিকেরা শাশ্বত নিয়মের শ্লোগান তুলে দিলেন।'

'হাতির খাবার আর দেখাবার দাঁত আলাদা' এটা মহারাজের পরমগুরুর দর্শনের এক প্রধান সিদ্ধান্ত। বোধহয় তাঁকে অনুসরণ করেই শিষ্য মহারাজ ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব' বাণীকে দাঁতের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন।

'শাস্ত্রানুসার···বিভিন্ন কারণে মূর্তি থেকে দেবত্ব লোপ পেতে পারে। তার ফলে সেই মূর্তির পূজোয় কোনো লাভ তো হয়ই না বরং লোকসানই হতে পারে।'

এখানে সাম্যের ধ্বজাধারী করপাত্রী মহারাজ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকেই ইঙ্গিত করছেন বলে মনে হয়। মন্দিরে যেদিন থেকে অচ্ছুৎরা প্রবেশ করেছে সেদিন থেকে, তাঁর ভাষায়, বিশ্বনাথের দেবত্ব লোপ পেয়েছে। তাই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজো দিলে কোনো পুণ্য তো হবেই না বরং পাপ হতে পারে। আর সেজন্যই করপাত্রী মহাশয় এক নতুন বিশ্বনাথ মন্দিরের স্থাপনা করেছেন। এখন শেঠ-বণিকদের উচিত কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে মহারাজের উক্ত মন্দিরটিকে সোনায় মুড়ে দেওয়া।

মুণ্ড গণনা নিরর্থক

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের সংখ্যাই প্রধান, অতএব তাদের মতামতই সর্বোচ্চ। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষই মত প্রদানের অধিকারী, যদি সুস্পষ্ট জনমত পক্ষে না থাকে, তাহলে উত্তরপ্রদেশের লৌহমানব বলে খ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রী চন্দ্রভান গুপ্তের মতো লোককেও হার মেনে নিতে হয়। সমস্ত পুঁজিপতিরাই এই প্রাপ্তবয়স্কদের মতামতের অধিকারকে মনে মনে অপছন্দ করে। করপাত্রী মহারাজ তাদের এই মতের সঙ্গে সহমত এবং সেজন্যই এই ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে বলেন 'মুণ্ড গণনা'।

'ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বদা সমাজকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্ণাশ্রম প্রথার সাহায্যে এক সামাজিক সমন্বয় সাধন করা আছে। শাসন বদলাতে পারে, কিন্তু ধর্ম ও সমাজ অপরিবর্তিতই থাকে।'

সমাজ বলতে অবশ্য উনি কি বোঝাতে চাইছেন তা স্পষ্ট নয়। আর জনগণ, তাদের প্রতি কোনো আস্থাই তো ওঁর নেই, কারণ : 'গণতন্ত্রেও বিবেকের অভাব আছে। নিরপেক্ষ, দূরদর্শী ঋষিদের রাজনৈতিক শাস্ত্র এবং ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন না থাকলে, বিবেক বস্তুবাদী গণতন্ত্রেও থাকে না, নিরপেক্ষ রাজতন্ত্রেও না। বিধান নির্মাণের জন্য পরিষদ গঠন না করে, বিধান নির্ণয়ের জন্যই পরিষদ গঠন করা উচিত।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধান নির্মাণের কাজটা আপৌরুষেয় বেদ আর নিরপেক্ষ ঋষিরা তাঁদের শাস্ত্র গ্রন্থে আগেই সেরে রেখেছেন অতএব তার জন্য নতুন করে পরিষদ গঠন করার কোনো প্রয়োজন নেই, এখন দরকার সেই বিধান অনুসারে কার্য নির্ণয় করা এবং তার জন্য পরিষদ গঠন করলেও করা যেতে পারে। অতএব : 'বহু-মতের কোনো মূল্য নেই।···নেত্রহীন কোটি কোটি অন্ধ রূপ-জ্ঞান বিচারে কখনোই সফল হতে পারে না। তাদের মতামতই গণ্য হওয়া উচিত যারা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।'

'রামরাজ্যে উদ্যোগের বিকেন্দ্রীকরণই লক্ষ্য।'

মহারাজ করপাত্রী বহুমতকে ততক্ষণ পর্যন্তই সহ্য করতে রাজী : 'যতক্ষণ পর্যন্ত বহুমত বিশেষজ্ঞদের (ঋষিদের) মতের সঙ্গে সংঘাতে না যায়।'

'আমাদের প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, মাথা গোনা। এভাবে মাথাগুণে কোনো যোগ্য শাসক পাওয়া শুধুমাত্র দুরূহই নয়, অসম্ভবও বটে। যে বা যারা বহুমতের অধিকারী হয়, শাসন ব্যবস্থার লাগামও থাকে তাদেরই হাতে।'

অতএব তাঁর মত, এই 'মাথা গোনা' বন্ধ হোক, পরিবর্তে আবার প্রাচীন প্রথাকে জিইয়ে তোলা হোক।

'ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর প্রথম রাজনীতিজ্ঞ শাসক তাঁদের রাজনীতির লাগাম, তপঃপূত, লোকহিতৈষী রাগদ্বেষহীন ঋষিদের হাতেই সঁপে দিয়েছিলেন।'

বর্তমানে আমরা ওরকম তপঃপূত, রাগদ্বেষহীন, লোকহিতৈষী ঋষি একজনকেই পেতে পারি — তিনি শ্রীশ্রী করপাত্রী মহারাজ। এ বিষয়ে কয়েকটি হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও মনে হয় আমাদের সঙ্গে একমত হবে।

কিছু লোক অবশ্য তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলছে, যে বৈরাগ্যের জন্য মহারাজ সংসারের সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করেছেন, এমনকি নিজের আহারের পাত্রটিকেও ত্যাজ্য বস্তুর সামিল করেছেন এবং নিজের করকেই পাত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, সেই মহাত্মার উচিত এ-সমস্ত পার্থিব ব্যাপারে না থেকে, বৈরাগ্যের পথেই আবার ফিরে যাওয়া।

মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলছেন : 'মহাত্মা ব্যক্তিদের এ-সমস্ত, ব্যঙ্গ, কটূক্তি গায়ে না মেখে, এর থেকে দূরে সরে ভজনা করে যাওয়া উচিত। অবশ্য একথাও ঠিক যে শাস্ত্র এবং ধর্মস্থান অপবিত্র হয়ে যাবার পর বিদ্বান এবং মহাত্মাদের ছাপ মেরে সরকারীকরণ করা হচ্ছে এ রকম অবস্থায় ভজন করার, ধার্মিক হবার মতো মন কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে।'

বোধহয় সেইজন্যই মহারাজ সাচ্চা ঋষিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাচ্চা ঋষিদের রাজত্ব

'ভারতবর্ষে যত বিশিষ্ট বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ আছে তার সমস্ত কটির রচয়িতা —অরণ্যবাসী, কন্দ-মূল-ফলাহারী, বল্কলধারী নিষ্কাম ঋষিগণ। বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক, যোগ, মহাভারত, রামায়ণ, যোগবশিষ্ট, শুক্র, বৃহস্পতি, কণিক, কৌটিল্য, কামন্দক প্রভৃতি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা আকিঞ্চন ব্যক্তিরা, কোনো ধনী বা পুঁজিপতিরা নয়। শংকরাচার্য, রামানুজ, ভট্টপাদ, শ্রীহর্ষ, বাচস্পতি মিশ্র, রামানুজাচার্য, তুলসীদাস, সুরদাস এরা কেউ অর্থবান ছিলেন না।'

অতএব করপাত্রী মহারাজের মতো আকিঞ্চন ব্যক্তিদের হাতেই সত্বর শাসন ব্যবস্থার ভার অর্পণ করা উচিত। মহাত্মাগণ কোমল হৃদয়, তাঁদের দ্বারা রাষ্ট্রের অহিত হতে পারে এমন ভাবাও অন্যায় কারণ : 'রামরাজ্যবাদীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য, আগামীকালের অনিবার্য যুদ্ধের সামনা সামনি হতে প্রস্তুত। মায়াবাদীদের সঙ্গে শুধু মাত্র সাধুতা দিয়ে পেরে ওঠা যাবে না।'

আজকালকার বস্তুবাদী, এবং ভারতবর্ষের সত্তর ভাগ জনতার নেতাগণ অবশ্যই বলবেন যে প্রাচীন দাস যুগের ঋষির দল কোনো দিক থেকেই আজকের যুগের ঋষিদের চেয়ে মহৎ ছিলেন না। তাঁদের বেসাতি সেদিনও মিথ্যের ভারে বিকাত, যেমন, আজ দেশের অন্য সজন জায়গায় চলছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য : 'পৃথিবীর মানুষকে ঠকিয়ে দুধের মাখনটুকুকে নিজে নির্বিবাদে ভোগ করো।'

রামরাজ্য পরিষদ শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠন

যে রাজনৈতিক সংগঠনের অঙ্গে রাম নাম যুক্ত, যে সংগঠন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাবার সাহস করতে পারে কোন দল ? মহারাজ সত্যভাষণ করেছেন : 'ভারতে কংগ্রেস, হিন্দুসভা, জনসংঘ ইত্যাদি সংস্কার-বাদী সংগঠন আছে। এরা একদিকে ভারতীয়তা, সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা বলে আবার পরিবর্তনেরও পক্ষে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট ইত্যাদি অরাজকতাবাদী রাজনৈতিক দল যারা সর্বদাই পরিবর্তন বা বিপ্লব চাইছে। এদের বিরুদ্ধে রামরাজ্যবাদী দল, শাস্ত্র এবং পরম্পরা অনুসারে সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে সিদ্ধান্তিকভাবে কণামাত্র পরিবর্তনও চায় না। রামরাজ্যবাদীরা ঈশ্বর, বর্ণ, এবং আত্মাকে মূল ভিত্তি মনে করে। অপৌরুষেয় বেদ, সেই বিষয়ের প্রাচীন শাস্ত্র এবং সেই সম্পর্কিত তর্কের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্ণয় করে। ...মার্কসবাদীরা বলে থাকে যে, 'জনগণের গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মেলে, অতএব, সমস্ত কিছুই জনতার নামে হওয়া উচিত। কিন্তু রামরাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি এবং সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দুইয়ের সমন্বয়ই সঠিক পদ্ধতি। একটি একটি করে সৈন্যের মৃত্যু হতে থাকলে এক সময় গোটা সৈন্যবাহিনীই ধ্বংস হয়ে যায়, সে রকম একব্যক্তি ধনবান বলবান হয়ে উঠলে সেটা গোটা সমাজেরই ধনবান বলবান হয়ে ওঠা হয়। রামরাজ্যবাদীরা সর্বত্র উৎফুল্ল ব্যক্তি বা শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অভ্যুদয়মুখী প্রগতিকেই শ্রেয় মনে করে। শ্রেণী সংগ্রাম একটি কুৎসা-মূলক প্রচার মাত্র।...ভালো লোকের মধ্যে শ্রেণীবাদ কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।'

এখানে মহারাজ অন্যান্য দলের সঙ্গে তাঁর দলের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলছেন : '...নিরপেক্ষভাবে সর্বহিতকর রামরাজ্য।'

'রামরাজ্যে বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ষোলো আনা সুরক্ষিত। মার্কসবাদী ব্যবস্থায় ধর্ম, সম্পত্তি, এমনকি প্রাণেরও প্রকাশ্য অপহরণ হয়ে থাকে। বৈধ সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ইত্যাদির কোনো মূল্যই মার্কসবাদীদের কাছে নেই।'

এইটুকুতেই শেষ নয়। ওঁর মতে রামরাজ্যবাদ সমস্ত অর্থনৈতিক পশ্চাৎ-পদতারও রামবাণ ওষধি : 'রামরাজ্য প্রণালীতে বেকারী, অনাহার প্রভৃতি থাকবে না। অর্থনৈতিক সংকটও আসবে না। অতএব পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, ঘাটতি, কখনোই দেখা দেবে না।

সমাজতন্ত্র এবং তার মহান প্রবক্তা কার্ল মার্কস বলেছেন যে, বেকারী পুঁজিবাদেরই অনিবার্য ফল, যার দূরীকরণ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব। বর্তমানে পুঁজিবাদের পীঠস্থান আমেরিকাতে বিশলক্ষ লোক বেকার। ইংলণ্ডেও এই সংখ্যা কয়েক লক্ষের ওপরে। কর্মরত শ্রমিকেরাও ছাঁটাইয়ের ফলে বেকার হয়ে পড়বার আশংকায় সদাই সশংক। অন্যদিকে সাম্যবাদী সমাজে বেকারিত্বের কোনো প্রশ্নই নেই। বরং ওখানে সব সময় চাহিদা অনুসারে শ্রমিক পাওয়া যায় না। তাহলে কি রামরাজ্যে এমন ঋষির আবির্ভাব ঘটবে, প্রকৃতিও যার বাধ্য হবে? শাস্ত্রে আছে ভরদ্বাজ মুনি প্রয়াগে বসে মুখের কথাটি খসালেন আর সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের সৈন্যবাহিনীর এক এক জনের জন্য শুধুমাত্র ভোজন সামগ্রী নয় মায় দাস-দাসী পর্যন্ত হাজির হয়ে গেলো। করপাত্রী মহারাজ বোধহয় ঋষিদের অনুরূপ দিব্যশক্তির দিকে ইঙ্গিত করছেন।

উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহৃত হলে বেকারি বাড়ে। করপাত্রী মহারাজ কিন্তু যন্ত্র বয়কট করার কথা বলতে পারছেন না। কারণ নিজেই এখন পদযাত্রা, গোযান কিংবা একাগাড়ির পরিবর্তে বিমান যাত্রা বেশি পছন্দ করছেন। তাছাড়া দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে কেউ কেউ মোটর গাড়ি কিংবা ইঞ্জিন তৈরির উদ্যোগে হাত লাগিয়েছে, যন্ত্র বয়কটের কথা তুলে সে সব পুঁজিপতি বেচারাদের ঝামেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলার কোনো ইচ্ছেই মহারাজের নেই। তবে খুব বিশালাকৃতির যন্ত্র, যা তাঁর ভাষায় মহাযন্ত্র তিনি অবশ্যই তার বিরোধী।

'রামরাজ্যবাদী···মহাযন্ত্র নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা আরোপের পক্ষে।···রাম-রাজ্যে সর্বদাই কাজ, মূল্য এবং বিশ্রামের উচিত বণ্টনের কথা বলা হয়েছে।'

কমিউনিস্টদের পথ ভ্রান্ত

মহারাজের মতে কমিউনিস্টরা শুধু মহাপাপীই নয়, তারা অপরাধী, তারা হত্যাকারী। এ বিষয়ে তিনি এবং আমেরিকান রাষ্ট্র নায়কগণ একমত। ভারত-বর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের এজেন্টদের এই তথ্যটা জেনে রাখা অবশ্যই উচিত এবং সম্ভব হলে অবিলম্বে মহারাজকে বিমানে আমেরিকা ঘুরিয়ে আনা উচিত। শাস্ত্রে বোধ হয় সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ, আকাশ যাত্রা নয়। তাছাড়া আকাশ অখণ্ড, অনন্ত, তার আবার ভারতবর্ষই বা কি আর আমেরিকাই বা কি। মহারাজ কমিউনিস্টদের বক্তব্যকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে বলছেন: 'মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশ বৃটেনে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সংঘটিত হলো মূলত কৃষিপ্রধান রাশিয়া এবং চীন এবং তাও কৃষকদের নেতৃত্বে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকায় কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম বাস্তবায়িত হলো না।'

কমিউনিস্টরাও জবাবে একটু ধৈর্য ধরুন, সেখানেও শ্রেণী সংগ্রামের তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে, যা একদিন প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করবে। তাছাড়া মার্কস একথাও বলেছিলেন যে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যে ধরনের সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার মাধ্যমেও সমাজতন্ত্রে পেঁছানো সম্ভব।

আর এটা কে না জানে রাশিয়া এবং চীনের বিপ্লবে কৃষকদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই ছিল।

অবশ্য মহারাজ কি করে এটা পছন্দ করতে পারেন যে, 'ধনিক-বণিকদের উচ্ছিষ্টে পালিত' শ্রমিকদের এমন সাহস হবে যে তারা তাদের প্রভুদের জমানারই অবসান করে দেবে। সেজন্যই তিনি বলছেন: 'কমিউনিস্ট আন্দোলন শুধুমাত্র ঈর্ষা ও বিদ্বেষকে মূলধন করেই টিকে আছে।'

'কমিউনিস্টদের জমিদারি প্রথার ওপর আক্রমণ কিংবা প্রাচীন প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ একথাই প্রমাণ করে যে, যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ন্যায় এবং সত্যের ভিত্তিতে তারা কোনোদিনই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিতে সক্ষম হবে না।'

'শ্রেণীবাদীদের মিথ্যা প্রচারে শ্রেণীভেদ, শ্রেণীবিদ্বেষ ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলির না আছে কোনো ভিত্তি, না এগুলি কোনো সিদ্ধান্ত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলন তাঁরই ভাষায় 'বেড়ে চলেছে' এটা তো বড়ই আশ্চর্যের কথা। আজ এশিয়া ইউরোপের বড় একটা অংশ এবং পৃথিবীর দুশো পঁচিশ কোটি লোকের মধ্যে একশো কোটি লোক এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। বাকী অর্ধেক পৃথিবীর মালিকদেরও আজ নিদ্রাহীন রাত কাটছে। এ ব্যাপার যদি মহারাজ যুক্তি দিয়ে বুঝতে না চান তাহলে সে দোষও আমরা কলিযুগের কুপ্রভাবের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি। মহারাজের 'সত্য' প্রতিষ্ঠার জন্য যদি 'মায়া' অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় নিতেও হয় তাতে তাঁর কোনো দ্বিধা বোধ নেই। সে জন্যই তো উনি নিরর্থক কথা ক্রমাগত বলে যেতেও ক্লান্তি বোধ করেন না : 'মার্কসবাদে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নামমাত্র বললেই চলে। ১৯৩৬ সালের আগে কমিউনিস্ট রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের ভোটের অধিকার ছিল না।'

যিনি জনমত সংগ্রহকে মাথা গোনা বলে বিদ্রূপ করেন, তাঁর আবার কোথায় কোন দেশে কার মতাধিকার নেই, তা নিয়ে চিন্তা কেন? তবে করপাত্রী মহারাজের অবগতির জন্য জানাই যে, মহারাজ যাদের কথা বলছেন, তাদের ১৯৩৬ সালের আগে থেকেই ভোটার তালিকায় নাম ছিল না, কারণ তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। তবে এ রকম বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা হাজারে একজনও হবে কিনা সন্দেহ।

মহারাজের নিম্নোক্ত ফরমানটিও মিথ্যা : 'কর্মে অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ মাতা পিতার কমিউনিস্ট সমাজে কোনো স্থান নেই।'

কমিউনিস্ট রাশিয়ায় ছাপান্ন বছরের পর প্রত্যেক কর্মচারী —শ্রমিক কিংবা বুদ্ধিজীবী —সকলেই অবসরকালীন ভাতা (পেন্‌সন্‌) পেয়ে থাকে। তারপরও যদি কেউ কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে, তার জন্য তারা অতিরিক্ত বেতন পাবার অধিকারী।

করপাত্রী মহারাজ এটাই ঘটনা!

মার্কসবাদীরা বা সমাজবাদীরা কাউকে ঈশ্বর ভক্ত হতে বাধা দেয় না। ইংলণ্ডের একজন কমিউনিস্ট সমর্থক পণ্ডিত ব্যক্তি সেখানকার গির্জার আর্চ-বিশপ ছিলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বরবাদ আর মার্কসবাদে ভয়ংকর কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। যে কোনো দেশে ঈশ্বর-আল্লার প্রতি বিশ্বাসী মানুষ কমিউনিস্ট-দের সমর্থক হতে পারে এবং হয়ও। বিশ্বাসের স্বাধীনতা কতদূর প্রসারিত হতে পারে এগুলি তারই প্রমাণ। তবে, যেখানে মার্কসবাদী দর্শনের প্রশ্ন সেখানে ধর্ম বা ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। কিন্তু করপাত্রী মহারাজ মার্কসবাদী এবং সমাজবাদীদের একেবারে নিরেট মূর্খ মনে করে বোঝবার চেষ্টা করছেন : 'ভারতে প্রতি হাজারে ন'শো নিরানব্বই জন সমাজবাদী সাধারণত ধার্মিক এবং ঈশ্বরবাদী হয়ে থাকেন, কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অবস্থানকে ভ্রান্ত মনে করা হয়।...তাদের মতানুসারে ভূত-প্রেতের কল্পনা এবং ঈশ্বরের কল্পনা একই বস্তু।'

'মার্কসবাদী এবং ঈশ্বরবাদী এই দুইয়ের সমন্বয় আদৌ সম্ভব নয়। অন্তত যিনি ঈশ্বরবাদী তাঁকে মার্কসবাদ ত্যাগ করতেই হবে।'

করপাত্রী মহারাজের পক্ষে এ রকম ভাবাটাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁর কাছে বণিকরাজ আর রামরাজ সমার্থক। আজকের পরিস্থিতিতে যদি তিনি রাজা হতেন, তাহলে একমাত্র ধনিক-বণিকেরাই সাচ্চা ঈশ্বর ভক্ত, এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভের একমাত্র অধিকারী, একথা অবশ্যই ঘোষণা করে দিতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

দাস, শূদ্র, স্ত্রী

দাসপ্রথার সমর্থন

রামরাজ্য আজকের বিষয় নয়। এটা আদিম কালীন বিষয়। ভারতে এর সমাপ্তি ঘটেছে ইংরেজদের দ্বারা ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার (দাসপ্রথা) উচ্ছেদ ঘটেছে মাত্র সওয়াশো বছর আগে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে এই প্রথার অন্ত হয়েছে চৌত্রিশ বছরও হয়নি। কিন্তু করপাত্রী মহারাজ দাসপ্রথাকে আজও বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র সম্মত মনে করেন : 'ঋষি অরস্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করতেন।···দাসত্বকে প্রাকৃতিক, নৈতিক এবং প্রয়োজনীয়— এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি উচিত বলে বিধান দিয়েছেন। শুধু এই নয়, করপাত্রী মহারাজের মতে দাসপ্রথা অভিশাপ নয়, বরং এটা সমাজের পক্ষে বরদান স্বরূপ ছিল।'

'দাসপ্রথাকে যতই নিরর্থক, অস্বাভাবিক এবং মূর্খতাপূর্ণ বলা হোক না কেন, কিন্তু কোনো না কোনো রূপে এই প্রথা আজও বর্তমান আছে এবং থাকবে।···কেনা জানে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকার বিরোধীদের সঙ্গে দাসদের চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হয়। জুলিই আধুনিক দাসপ্রথার উদাহরণ।'

'আজকের গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা দু'হাজার বছর আগের অশোকের রাজত্বে সুখ সমৃদ্ধি এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সেই রাজত্বে প্রত্যেকে নিজেকে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী মনে করত। পাঁচ হাজার বছর আগের মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের শাসন ধর্মরাজ্য ছিল। লক্ষ বছর আগের রামরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো শাসন ব্যবস্থা না কোনোকালে ছিল, না বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

১৮৩৪ সালের আগে এদেশে দাসপ্রথা চালু ছিল। দাসপ্রথায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জন্তু জানোয়ারের মতো বিক্রিত হতো, যার প্রমাণ আজ থেকে সাতশো বছর আগের গুজরাটের এক দাসী বিক্রয়-পত্র থেকে পাওয়া যাবে।

দাসী বিক্রয়-পত্র

সম্বৎ ১২৮৮ (১২৩১ খৃঃ) বৈশাখ সুদী ১৫ বৃহস্পতিবার। আজ এখানে (অনহিল-পাটন) সমস্ত নৃপতি সুলভ গুণ সম্পন্ন পরম ভট্টারক···শ্রীমান ভীমদেবের মঙ্গলবিজয়স্থিত রাজ্যে দাসী বিক্রয়-পত্র লিখিত হইতেছে। যথা : 'রাণা প্রতাপসিংহ কর্তৃক আনীত গৌরবর্ণা, ষোড়শ বর্ষীয়া পনুর্তী নাম্নী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাসী মস্তকে তৃণ ধারণপূর্বক নগরের পঞ্চপ্রমুখদের জ্ঞাতসারে রাজপথের সংযোগস্থলে বিক্রিত হয়েছে। ক্রেতা আসধর, গৃহের দাসী কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীপ্রতাপ সিংহকে পাঁচশত চার দাম (দ্রম্য) মূল্য দিয়ে পনুতী নাম্নী দাসীকে সমস্ত নগরীর চতুর্বর্ণের পঞ্চপ্রমুখদের জ্ঞাতসারে ক্রয় করিয়াছে।

'অতঃপর এই দাসী তার ক্রেতার গৃহে যাবতীয় গৃহস্থালী কর্ম যথা তরকারি কাটা, মশলা পেষা ঘর ও গৃহ প্রাঙ্গণ ধোয়া, পরিষ্কার করা, ইন্ধন সংগ্রহ করা, জল তোলা, মল-মূত্র পরিষ্কার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরন্তু গৃহপালিত গো-মহিষ-ছাগ দোহন করা, দধি মন্থন করা, ক্ষেতে খামারে আহার্য পানীয় পৌঁছানো, গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ করা, সুতা কর্তন ও বয়ন, এবং গৃহের অভ্যন্তরের ও বাহিরের আরো নানাবিধ কার্য নির্দ্বিধায় করিতে বাধ্য থাকিবে। এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনের বিনিময়ে ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি এবং দেশ কালের বিচারানুযায়ী দাসীকে ক্রেতা আহার ও বস্ত্র তার চাহিবার পূর্বেই প্রদান করিবে। যদি এই দাসী ক্রেতার গৃহে কর্মরত অবস্থায় ; তাহার পিতা, ভ্রাতা ও পতির প্ররোচনায় এমন কোনো কার্য করে যাহাতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আরব্ধ কার্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্রেতা দাসীকে বন্ধন, তাড়ন, প্রহার ইত্যাদি নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এই পত্রে বর্ণিত কর্মসমূহ করতে বাধ্য করিবে। প্রয়োজনে দাসীর কেশ আকর্ষণ করে, পদাঘাত, যষ্ঠীর আঘাত ইত্যাদি প্রয়োগ করার অধিকার ক্রেতার থাকিবে। উপরোক্ত শাস্তির ফলে যদি দাসীটির মৃত্যু হয়, তাহলে চতুর্বর্ণের সকলকে অনুধাবন করিতে হইবে যে তাঁর প্রভু নির্দোষ, দাসীর কর্মফলই তার মৃত্যুর কারণ। অতএব মৃত্যু জনিত স্পর্শ দোষ ক্ষালনের জন্য স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র সমেত প্রভুর গঙ্গাস্নান বিধেয়। যদি কোনো কারণে দাসী জলে ডুবে কিংবা বিষ ভক্ষণে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাহলেও নগরীর পঞ্চ-প্রমুখদের যেন বিদিত থাকে যে প্রভু নির্দোষ, দাসীটি তার পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। এক্ষেত্রেও প্রভুর জন্য সপরিবারে গঙ্গাস্নানের বিধান দেওয়া হইল। এই বিক্রয়পত্রে লিখিত কর্তব্য-কর্ম পালন করানোর জন্য রক্ষপাল (পুলিশ) এবং নগরবাসীরা সাক্ষী। এই বিষয়ে রাণা প্রতাপসিংহ এবং চারজন রক্ষপাল তাদের নামানুসারে নিজ হস্তে লিখিতভাবে মত প্রদান করিয়াছেন। এই বিক্রয়পত্র উভয় পক্ষের প্রার্থিত লিপিকারের দ্বারা লিখিত।'

দাসপ্রথার ঘৃণ্যরূপ আমরা পনুতী নাম্নী দাসীটির বিক্রয়-পত্রে দেখলাম। কিন্তু মহারাজ এই ঘৃণ্য প্রথারও কত মনোমোহন চিত্র উপস্থিত করতে প্রয়াসী :

'দাসপ্রথার যুগেও, দাস যদি কর্মক্ষম না থাকত তাহলেও প্রভুর গৃহে আত্মীয়ের মতো বাস করত।'

'বস্তুত তখন দাসেরা নামেমাত্রই দাস ছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল পরিবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন। সেজন্য গৃহকর্তা সর্বাগ্রে এদের আহার বস্ত্রের সংস্থান করতেন, তারপর নিজের।'

দাসপ্রথা যে আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না, এই সত্যটা বোধহয় করপাত্রী মহারাজের ঐশ্বরিক জ্ঞানেও ধরা পড়েছে। তবুও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের অভ্রান্ত শাস্ত্রের সমর্থন করে যাওয়াটা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তিনিও সে কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

শূদ্র নীচ

বিধির বিধানেই পৃথিবীতে তথাকথিত শূদ্রেরও আগমন ঘটেছে। পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণেই তার এই জন্ম। বোধহয় তাদের শরীরে সেই বস্তু বা পরমাণু নেই যা ব্রাহ্মণের শরীরে কিংবা করপাত্রী মহারাজের শরীরে বর্তমান। এরা সেই বস্তু বা পরমাণুতে নির্মিত যা দিয়ে এদের সৃষ্টিকর্তাও নির্মিত।

'শূদ্র ইত্যাদি জাতির মধ্যে যে ধরনের বা মাত্রার পরমাণু বর্তমান, তার পরিবর্তে যদি ব্রাহ্মণ জাত্যারম্ভক কর্মবিশিষ্ট পরমাণু সন্নিবিষ্ট থাকত তাহলেই তার আকৃতি এবং ব্যবহার ব্রাহ্মণের মতো হতো।

'যজ্ঞে শূদ্রদের সেবাকর্মে নিযুক্ত করে এবং সেই সেবা গ্রহণ করে···ব্রাহ্মণকে যাজনের অধিকার দিয়ে সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে।'

সত্যি অপূর্ব সমন্বয়! শূদ্রের ভাগে কপর্দক···আর ব্রাহ্মণের ভাগে—'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্' অর্থাৎ —হে যজমান যজ্ঞে রূপো দিও না। দিলে সোনাই দিও।

করপাত্রী মহারাজ বলতে চাইছেন, জন্মের মধ্যেই ব্রাহ্মণত্ব নিহিত। তার পূর্ব কর্মফল বলবান হওয়ার ফলেই তার ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম হয়। কৃষ্ণ সর্পের মতো বাহ্যত কারো ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ না পেলেও —তার মধ্যে ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণাবলীই নিহিত থাকে।

'···ব্রাহ্মণ ইত্যাদির বাহ্য প্রভেদ সাকার না হলেও শাস্ত্র প্রমাণিত বিভিন্ন গুণ-ধর্ম, রক্তের পার্থক্যের কারণেই ফুটে ওঠে, এটা অনিবার্য।'

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কপিল পিঙ্গল কেশ (ইংরেজদের মতো শ্বেত এবং তামাটে রঙের চুল) যাদের আছে তাদেরই ব্রাহ্মণ বলেছেন। আজকের কোনো ব্রাহ্মণই, ব্রাহ্মণত্বের এই সংজ্ঞা মেনে নেবে না। বস্তুত যাদের গায়ের রঙ কালো অথচ নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দেয়, তাদের শরীরে অবশ্যই প্রাচীন নিষাদ রক্তের মিশ্রণ আছে। তবে এই বৈজ্ঞানিক সত্য করপাত্রী মহারাজ মানতে বাধ্য নন। এ সমস্ত তাঁর ভাষায় নির্বোধ আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্য তোলা থাক।

রঙের ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে বর্ণ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য : 'শুভ-অশুভ কর্মের ফলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উচ্চ জাতির মধ্যে জন্ম হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বৈদিকদের মতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতি, বৃক্ষ ইত্যাদির মতোই প্রত্যক্ষ এবং সিদ্ধ।'

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলাটা ভুল হবে ধর্মবিতার। যদি একই ধাঁচের পোশাক পরা তথাকথিত শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড় করানো যায়, তাহলে আপনার মতো ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষও তাদের মধ্যে কে ব্রাহ্মণ আর কে অব্রাহ্মণ তা আলাদা করতে পারবেন না।

যদি কিছুক্ষণের জন্য আমরা মেনেও নিই যে, কর্মের বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন বর্ণে মানুষের জন্ম হয়ে থাকে, কিন্তু কর্ম সম্পর্কীয় নির্ণয়গুলি অর্থাৎ 'কোন কর্মের ফলে কোন যোনিতে জন্ম' এগুলি কে ঠিক করে? উত্তরে মহারাজ বলছেন: 'মহাত্মা, আপ্তকাম, নিরাশস্ত মহর্ষিগণ পরম সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক দৃষ্টি এবং অপৌরুষেয় বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রের সহায়তায় কর্মের নির্ণয় করে থাকেন।'

অর্থাৎ শূদ্রদের ভাগ্যের বিচার ঋষিদের দ্বারা কর্ম বিভাজন নীতি মারফৎ করে ফেলা হয়েছে। অতঃপর তাদের কি আচার-আচরণ হওয়া উচিত, সমাজে তাদের সঠিক স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে মহারাজ জানিয়েছেন: '…বর্ণানুসারে জীবিকা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।'

'প্রাচীন ভারতে শূদ্রদের বিদ্যাভ্যাস অন্যায় ছিল।'

করপাত্রী মহারাজদের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রাহ্মণদের জন্যই আজকালকার দলিত শোষিত সম্প্রদায়গুলি আওয়াজ তুলেছে 'ব্রাহ্মণ, ছত্রী, (ক্ষত্রিয়) লালা এই তিনের মুখ কালা; এদের চাই দেশ নিকালা' অর্থাৎ কালামুখ বামুন, ছত্রী, লালাদের নির্বাসন চাই। এর মধ্যে লালাদের নামও শোষকদের দলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি লালা বলতে কায়স্থদের বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে বহু কট্টর ব্রাহ্মণ এই কায়স্থদেরও শূদ্র বলেই জ্ঞান করে। করপাত্রী মহারাজ আজকাল প্রায়শঃ শূদ্ররাজ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। বোধহয় এই শব্দটি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের শাসনের কর্ণধারকে লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গত এই শাসকপ্রধান জাতিতে কায়স্থ সম্প্রদায়ের। তবে বর্তমানে অধিকার বঞ্চিত শোষিতদের সারিতে করপাত্রী মহারাজ বর্ণিত বর্ণাশ্রম প্রথা ঘোষিত সম্প্রদায়গুলিই একমাত্র দাঁড়িয়ে নেই। শোষিত মানুষ, তা সে যে কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, সে বৃহত্তর শোষিত সমাজেরই একটা অঙ্গ, এবং এই সমাজের হিত-অহিতের সঙ্গেই তাদের ভাগ্যও জড়িত। যদি করপাত্রী মহারাজের রামরাজ্য সত্যি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহলে সেই সমাজে শূদ্রদের শুধুমাত্র সেবা করার অধিকার থাকবে। তারা বাসন মাজবে, কাঠ কাটবে, শৌচাগার পরিষ্কার করবে আর প্রভুদের যা উচ্ছিষ্ট জুটবে তাই আধপেটা খেয়ে দিন কাটাবে। তাদের শিক্ষার কোনো অধিকার থাকবে না। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা না পেলে কায়স্থর কায়স্থত্বই থাকে না, কারণ কলমই কায়স্থদের প্রধান অস্ত্র। শিক্ষার অধিকার না থাকলে বাবু জগজীবন রাম কোনোদিন কেন্দ্রের মন্ত্রী হতে পারতেন? করপাত্রী মহারাজের রামরাজ্যে যা নিষিদ্ধ কলিযুগে সেটাই প্রথা। আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সন্তান চাকরী না পেয়ে নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে, কেন তাদের জন্ম তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীতে হলো না, তাহলে তারা অন্তত সংরক্ষিত কোটায় চাকরী পেতে পারত। আজ শূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। করপাত্রী মহারাজের সম্প্রদায়ের অনেক 'পংক্তি ব্রাহ্মণ'ও আজকাল অচ্ছুৎদের রসুই ঘরে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছেন। অবশ্য এদের গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতো অত খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই। একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সেই বাড়ি পংক্তি ব্রাহ্মণের হতেই পারে না যার সামনে এবং পেছনে কিছু মাংসের হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখা না যায়। যদিও ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ তেমন ব্যাপকভাবে চালু হয়নি, কারণ প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা অবশিষ্ট তিনটি বর্ণ থেকেই কন্যা ঘরে আনতেন কিন্তু নিজেদের ঘরের কন্যা সমবর্ণেই দিতেন। পরাশর মুনির সুপুত্র মহাভারত রচয়িতা ব্যাস ছিলেন মাছধরা জেলেনীর গর্ভজাত। বোধহয় সেজন্যই তাঁর গায়ের রঙ ছিল কালো। বর্তমানে কলিযুগে অনুলোম প্রতিলোম উভয় বিবাহ প্রথারই পথ খুলে দিয়েছে। হয়ত এপথে এখন দু'-একজন পথিকের চলাচল, কিন্তু সময় আসছে, যেদিন রুটি আর বেটি (কন্যা) কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সবস্তর উচ্চনীচের বন্ধন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

স্ত্রী পরতন্ত্র

তা তিনি ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষই হোন অথবা কোনো তপঃপূত মহাঋষি, সকলেরই জন্ম কিন্তু নারীর গর্ভে। অথচ ওই সমস্ত মহাপুরুষেরা নারীর কোনো স্বাধীনতা নেই বলেই ফতোয়া জারি করেছেন। করপাত্রী মহারাজ ওই ফতোয়াকে বিধির বিধান মনে করে বসে আছেন: 'অনাদি কাল থেকে বেদাদি শাস্ত্রানুসারে নারীরা সর্বদাই পরতন্ত্রী থাকে এবং পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করে।'

'এখনও দেখা যায় যে সংসারে কন্যা কুমারী অবস্থায় পিতা কিংবা ভ্রাতাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। নয় দশ বছর বয়সে তাদের বিবাহ হয়। শ্বশুর বাড়িতে অবরোধের মধ্যে বাস করে। শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। ঘরের ভেতরেও অবগুণ্ঠনের আড়ালেই নিজেকে রাখে। যেখানে অবগুণ্ঠন প্রথার চল নেই, সেখানেও দৃষ্টি সংবরণের জন্য কোনো আড়াল থাকে। সঙ্গে কোনো কুটুম্বিনী ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। বাইরের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা এক অসম্ভব ব্যাপার। এ রকম অবস্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহীন। এ রকম অবস্থায় কোনো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ব্যভিচার হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক, অসম্ভব। ঋতুমতী হবার পর মেয়েদের মনে নানা ধরনের বিকার আসতে পারে, যার ফলে তার মন অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে। সেজন্য কন্যা রজঃস্বলা হবার আগেই তার বিবাহ দেওয়াই প্রথা। পাতিব্রত্য ধর্মের পালন, বৈধব্য পালন, সতী ধর্মের প্রচারে সতত যাদের দৃষ্টি,…সেই সমস্ত নারী, বিশেষত প্রাচীন কুলাঙ্গনাদের শুদ্ধতার প্রতি অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।…পাঞ্জাবী, মৈথিলী বাঙালী, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের রঙ আকৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও ব্রাহ্মণত্ব সমানই থাকে।'

কপিল পিঙ্গল কেশ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাজল-কালো চুল কি করে চলে এল এর ব্যাখ্যা জীববিদ্যাবিদ্‌রা বলে থাকেন, কোনো এক পুরুষে নিষাদ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে ছিল। দাসত্বের যুগে তো মহারাজের মতে নিষাদ বংশোদ্ভূত দাস ব্রাহ্মণ প্রভুর পরিবারে আত্মীয়ের মতোই বাস করত।

করপাত্রী মহারাজ মেয়েদের অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত কিছু মনে করেন না। তাই তাঁর বক্তব্য : 'কন্যার ওপরে তার মা বাবারই অধিকার থাকে। বাবা তাকে যার হাতে তুলে দেন, সেই তার স্বামী।

'রামরাজ্য প্রণালীতে বালিকা অবস্থাতেই মেয়েদের বিবাহ হবে। পুরুষের কাজ বাইরে, মেয়েদের কাজ গৃহের অভ্যন্তরে।'

হতচ্ছাড়া কলিযুগ যেভাবে মেয়েদের স্বাধীনতার জন্য প্রলুব্ধ করে চলেছে, তাতে মহারাজ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ : 'স্বাধীনতা, আত্ম নির্ণয়ের অধিকার, ইত্যাদি মনোমোহক কথাবার্তার ধুম্রজাল বিস্তার করে, মেয়েদের পথভ্রষ্টা করে তাদের নিজের শিকারে পরিণত করে এবং পরে তাকে মজুরি অথবা পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করে। তাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়ার মতো ঘোর অন্যায় কাজ আজকাল প্রায়শই ঘটছে। মানবজীবন, এবং গৃহাঙ্গণ উভয়কে আক্ষরিক অর্থে মাঙ্গলিক করে তুলতে একমাত্র মেয়েরাই পারে। এর ওপর তাদের মাথায় আবার উপার্জনের বোঝা না চাপানোই ভালো।'

'সমাজবাদী এবং সমষ্টিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা হয় শ্রমজীবিনী নয়তো উৎপাদনের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের কেবল পুরুষের ভোগ তুষ্টির সামগ্রী মনে করা হয় না…রামরাজ্য প্রণালীতে মেয়েরা হবে গৃহলক্ষ্মী।'

'তাদের কলে কারখানায় মজুরি করতে যেতে হবে না।…মার্কসবাদে মেয়েদের জন্য সরকারী গোলামি অথবা সরকারী মজুরনি হওয়াই নির্দিষ্ট। মেয়েদের শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী পুত্রের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা বা সন্তান লালন পালনে ব্রতী হওয়া, মার্কসবাদীদের চোখে অসহ্য।'

করপত্রী মহারাজ মনে হয় একচক্ষু ব্যক্তি। তাঁর কি জানা নেই যে এ-দেশের নব্বই ভাগ মেয়ে অবরোধে বা পর্দার আড়ালে থাকতে পারে না। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের এবং বাইরের দু-জায়গার কাজই করতে হয়। আজকাল কেবল শূদ্রের ঘরের মেয়েরাই নয়, করপাত্রী মহারাজের মতো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ঘরের মেয়েদেরও বাইরে বের হতেই হচ্ছে। মেয়েদের জন্য আবার যদি পরদা প্রথা চালু করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক বাড়িতেই হারেমের মতো আলাদা করে রনিবাস বা মেয়ে মহল তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটা তাদের পক্ষেই করা সম্ভব যাদের আয় প্রচুর, বাসগৃহের আয়তনও বিশাল। বস্তুত একমাত্র সমাজবাদী সমাজেই মেয়েদের উৎপাদন সামগ্রী বলে বিবেচনা করা হয় না। প্রাচীন সমাজেও কিন্তু মেয়েদের উৎপাদন সামর্থ্যই মনে করা হতো। পরিবার প্রতিপালন করার বিরোধিতা কেউ করে না। তবে ওই দায়িত্বের সবটাই মেয়েদের ঘাড়ে চাপানো-টাও ঠিক নয়। পুরুষদেরও এতে সাহায্য করা উচিত। 'শ্বশুর-শাশুড়ী রাজত্বের সাম্রাজ্ঞী' বলে তাদের আর তুষ্ট রাখা যাবে না। মেয়েদের স্থান সমাজে পুরুষ-দের সঙ্গে এবং সমান মর্যাদায়। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শারীরিকভাবে মেয়েরা যে কাজের উপযুক্ত নয় সেটা তাদের ওপরে চাপিয়ে দিতে হবে। বিদ্যা-বুদ্ধিতে গার্গী, মদালসা, লীলাবতীর মতো মহিলারা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে খাটো ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে তর্কে হারাতে না পেরে মাথা কেটে নেবার হুমকি দিয়েছিলেন। 'মেয়েরা স্বাধিকারের যোগ্য নয়' পুরানো পুঁথি পত্রের এ সমস্ত প্রলাপোক্তি মহারাজের কৃপাধন্য অজীর্ণ বুদ্ধির শেঠ-বণিকের দলই একমাত্র শুনতে রাজী থাকতে পরে। দেশীয় রাজা মহারাজাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের রনিবাসের অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা আকাশের নিচে এনে ফেলেছে, এ অবস্থায় চামচিকেদের মুখ লুকোবার মতো অন্ধকূপেরও অভাব দেখা দেবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

বিবর্তনবাদ-ধর্ম-ঈশ্বর-আত্মা

করপাত্রী মহারাজ দণ্ডী সন্ন্যাসী, শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর পুঁথিটি পড়লে মনে হয় যে এক ধরনের সুবিধাবাদী বক্তব্যই তাঁর সিদ্ধান্ত। তাই তিনি দিগন্ত-প্রসারিত বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলিকে পোঁটলাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত করতে উৎসাহী। তিনি বলেছেন যে, যদিও শংকরের মায়াবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের দৃঢ় অংশকে দূরে সরিয়ে রেখে। মায়াবাদে জগতের সত্যতার অপলাপ করা হয়েছে। জগৎ, বস্তুত তিনকালে কোনো কিছুই নয়, সবই মায়া, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম। শেঠ-বণিকের দলও ভ্রম মাত্র। তাহলে তাদের নিয়ে মহারাজের কেন এত মাথাব্যথা। তিনি অবশ্য বলতে পারেন —সমস্ত ভারতীয় দর্শন জগৎকে মায়া বলে মনে করে না, এবং তাদের পক্ষ থেকেই আমি বিবর্তনবাদের খণ্ডন এবং ঈশ্বর ও আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হচ্ছি। এবার তাঁর প্রদত্ত যুক্তির দিকে একটু দৃষ্টি-পাত করা যাক।

বিবর্তনবাদ

মার্কসবাদ বস্তুবাদী দর্শন। এখানে বস্তুকেই সমস্ত কিছুর কারণ বলে ধরা হয়, আর এই দার্শনিক দৃষ্টিতে কোনো অচল, বিকারহীন পরমাণু নয় বরং তা দেশ ও কালে অত্যন্ত সচল, গতিশীল এবং ক্ষণিক। বস্তুর নিজস্ব গতিই জগৎ এবং জগতের প্রতিটি বস্তুর উদ্ভব ও বিবর্তনের কারণ। এর জন্য আর কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না। এর বিরুদ্ধে মহারাজের বক্তব্য :

'জড় পদার্থ থেকেই সমস্ত বস্তু উদ্ভব, এমন কথা বলা যায় না। সাংখ্য-বাদীরাও সৃষ্টি প্রপঞ্চকে স্বতন্ত্র, ব্যাপক, অসঙ্গ চেতন, আত্মা এবং প্রকৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এ-প্রসঙ্গে সাংখ্যবাদীদের 'পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায়' প্রসিদ্ধ। যেমন পঙ্গু চলতে পারে না, আর অন্ধ দেখতে পায় না। যদি দু'জনে মিল হয় তাহলে পঙ্গুকে কাঁধে নিয়ে অন্ধ পথ চলতে পারে, আর পঙ্গু পথের দিশা দেখাতে পারে। এভাবে অন্ধের পা এবং পঙ্গুর চোখের সাহায্যে 'গমন' প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। সে রকমই অন্ধ-তুল্য অচেতন প্রকৃতি আর পঙ্গু-তুল্য গতি-শক্তি রহিত চেতন পুরুষ এই দুইয়ের সমন্বয়েই চলছে সৃষ্টি প্রপঞ্চ। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায়, অচেতন রথ ইত্যাদির ধর্ম চেতন অশ্বের ওপরেই নির্ভরশীল, যান্ত্রিক গতির মূলে থাকে সংযোজক। কতকগুলি সামগ্রীর সমাহার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও কর্তা হতে পারে না। সংঘাত বা বস্তু-সমাহার মাত্র কর্তা হতে পারে না।'

বেদান্তে কাজ না হওয়ায় মহারাজ সাংখ্যের শরণাপন্ন হয়েছেন। সাংখ্যের চেতন পুরুষ এক চেতন নয় বরং অনন্ত চেতন। যখন পুরুষের মধ্যে ক্রিয়ার কোনো শক্তিই থাকে না, তখন এ ধরনের ঠুঁটো (স্থানু) পুরুষ দ্বারা প্রকৃতিতে কোনো গতি আসতে পারে কি ? ঘোড়া যদি খোঁড়া হয়, তাহলে তাকে দিয়ে কি রথ টানার কাজ চলে ? নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রকৃতির বিবর্তনের পক্ষে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতিতে যদি সত্যি গতি থেকে থাকে, যেমন সাংখ্যবাদীরা মেনে থাকেন, তাহলে তার কার্য করার জন্য অন্য কারো আবশ্যকতা নেই। একত্রিত বহু সামগ্রীর মতো অনেকগুলি কারণের একত্রিত হওয়াটাই কারণে পরিণত হয়। বৌদ্ধদর্শন একে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে : 'এক চৈকমেক-মেকস্মাত সামগ্রয়া সর্ব সম্ভবঃ'। (প্রমাণবার্তিক)

এক ব্রহ্মের দ্বারা কোনো কিছু সৃষ্ট হতে পারে না, সমস্ত কার্যই কারণ-সামগ্রীর দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আবশ্যক কারণের সমাবেশে যদি একটি তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কারণেরও অভাব থাকে তাহলে কার্য কখনও সৃষ্ট হতে পারে না। জগতে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে একটি মাত্র কারণ কার্য উৎপন্ন করছে। একটি ঘট নির্মাণে কেবল কুম্ভকার কারণ নয়, মাটিও নয়। ঘটটি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছে আরও অনেক কারণের একত্রিত হওয়ার, যেমন, কুম্ভকারের চাকা, লাঠি, জল, কাটবার সুতো ইত্যাদি ইত্যাদি। করপাত্রী মহারাজের দর্শনে তো কেবল পঙ্গুকেই পাওয়া যাচ্ছে, অন্ধ এখানে মায়া মাত্র। সেজন্যই তিনি এখানে 'পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায়' প্রয়োগ করতে পারেন না।

গতি এবং ক্ষণে ক্ষণে আমূল পরিবর্তন বিশ্বের সার্বিক নিয়ম। এর ফলে দেশ-কালের অব্যক্ত গতি ব্যক্ত হয় আবার ব্যক্ত গতি রূপান্তরিত হয় অব্যক্তে। জীবনের বিবর্তন তত্ত্ব এর দ্বারাই সমর্থিত হয়। বিবর্তনবাদ কোনো উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, না কোনো নেশাখোরের চণ্ডু টানার নল। পৃথিবীর দেহের অবশিষ্ট অবশেষ এবং গর্ভাবস্থায় অব্যাহত প্রগতির মধ্য দিয়ে বিবর্তন-বাদ প্রমাণিত। মে, ১৯৫৮ 'ত্রিপথগা'তে অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যালডেনের একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে, অধ্যাপক হ্যালডেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানীদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। তিনি লিখেছেন : 'প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিকগণ পরিণাম বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত তা থেকে ভিন্ন। সর্বপ্রথম ফরাসী দেশের লেমার্কই এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতি জীববিজ্ঞানীদের আস্থা উৎপাদনের কৃতিত্ব ডারউইনের। ডারউইন এই বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক রূপ ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে আমিও তাঁর মতকে অধিকাংশক্ষেত্রেই সঠিক বলে

Riton দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করি। ...বিবর্তন প্রক্রিয়ার দুই ধরনের প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। এক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা ফসিল থেকে, আর দ্বিতীয় প্রজনন বিজ্ঞান থেকে —অর্থাৎ জীবিত গাছপালা এবং ধাতুর বাস্তবিক প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে সমস্ত প্রাচীন শিলাস্তরে পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত ফসিল পাওয়া যায়, তা প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছরের পুরানো। অবশ্য এর চেয়েও পুরানো ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং মনে হয় পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল একশো কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে ফসিল পাওয়া যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ ভারতকে নেওয়া যেতে পারে। এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে। উত্তর ভাগে গঙ্গা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাদামাটির আধিক্য। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা পর্যন্ত মাটির নিচে যে শিলাস্তর বর্তমান, সেখানে খুঁজলে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা ফসিলের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।'

হ্যালডেন বিবর্তনবাদের আলোচনা করতে গিয়ে বিষ্ণুর অবতারতত্ত্বের উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন: '৩৫ কোটি বছর আগে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ (মীনাবতার) ছিল সর্বাপেক্ষা বিবর্তিত প্রাণী। ২৫ কোটি বছর আগে সেই জায়গা নিলো বুকে-হাঁটা উভচর বা সরীসৃপ (কূর্মাবতার), ৬ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ যার আকৃতি ছিল অনেকটা বরাহের মতো, (বরাহ-অবতার), দেড় কোটি বছর আগে কিছু মানবোচিত গুণ সম্পন্ন প্রাণীর (নৃসিংহাবতার) উদ্ভব হয়, ১০ লক্ষ বছর আগে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম মানবেতর প্রাণী (বামনাবতার), যারা মানুষ ছিল না, কিন্তু বাঁদরের তুলনায় মানুষের সঙ্গেই তাদের মিল ছিল বেশি —এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত জীব।'

ফসিলের অস্তিত্ব কোন জন্তুর, তার প্রাচীনত্ব, ইত্যাদি নির্ণয় করা এখন কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়। এ সম্বন্ধে হ্যালডেনের বক্তব্য: 'আমি এখন এই সময় কিছু কিছু বিশ্লেষণ দৃঢ়তার সঙ্গেই উপস্থাপিত করতে পারি, কারণ শিলাস্তরের তেজস্ক্রিয়তা থেকে উৎপন্ন বস্তু ঠিক মতো সঞ্চিত থাকে এবং তার সাহায্যেই শিলাস্তরে প্রাচীনত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।'

বর্তমান বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকৃত। এই তত্ত্বকে যাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট, তাঁদের নিছক উপহাসাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

কিন্তু এ-বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য হচ্ছে: 'তুলনামূলক শারীরতত্ত্বে বিবর্তনবাদ স্বীকৃত নয়।'

অবশ্য তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য শুধু মাত্র বিতণ্ডা সৃষ্টিই করতে পারে, আর কিছু নয়, কারণ হ্যালডেন ওই প্রবন্ধেই বলেছেন: 'তুলনামূলক ভ্রূণ-বিজ্ঞান দ্বারাও বিবর্তনবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত প্রাণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবর্তনের ধরনও একই ধাঁচের। অনেক প্রাণী যারা পূর্ণ বিকশিত হওয়ার পর একে অপরের সঙ্গে কোনোভাবেই মিল খায় না, তাদের মধ্যেও ভ্রূণাবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়।'

বিবর্তনবাদ ঈশ্বরবাদী ধর্মের মূলে এত প্রবলভাবে আঘাত করে যে তার ভিত্তিই নড়ে ওঠে। নিজেদের নিন্দনীয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য ধর্ম এবং ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা এ জন্যই তাদের দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবর্তনবাদ বিষয়ক পঠন-পাঠন আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। করপাত্রী মহারাজের অধীনেও যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থাকত, তাহলে তিনিও আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। কিন্তু বিবর্তনবাদ হলো একটি বিজ্ঞান, কোনো অপ্রমাণিত যুক্তি আশ্রিত কল্পনা নয়।

করপাত্রী মহারাজের এটিও একটি ভ্রান্ত মন্তব্য: 'বর্তমানের কোনো উপায়েই পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করা সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে সন্ধান করাও অসম্ভব।'

তেজস্ক্রিয় অবশিষ্ট পদার্থ থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি বছরের কম নয়। পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান যদি অভ্রান্ত, ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অধিকারী ঋষিদের না থেকে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে সমগ্র পৃথিবী তেমনই আমাদের অজানা থেকে যাবে। পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা এখন সকলের জানা। বর্তমানে এই গোলাকৃতি পৃথিবীর মানচিত্রও নির্মিত হয়েছে। আরো সুবিধার জন্য একে বর্গাকৃতি (গ্রাফ) খণ্ডের মধ্যে আঁকাও সম্ভব হয়েছে। এই মানচিত্রের ওপর নির্ভর করে প্রতিটায় কয়েকশো মাইল বেগে উড়ে চলেছে বিমান। যদি মানচিত্র ভুল হতো, তাহলে বিমানগুলি পথভ্রষ্ট হয়ে অন্য কোথাও চলে যেত। অতএব এর সত্যতার প্রতি নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। তবে এই মহাকূপ-মণ্ডূকদের সম্বন্ধে কিই বা আর বলা যেতে পারে যারা ভূগোলবিদ্যার প্রগতির কোনো খবরই রাখে না।

করপাত্রী মহারাজ বোধহয় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর বইয়ের এক জায়গায় বিবর্তনবাদকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেই এখনও অটল আছেন, বোধহয় তিনি নিজের চোখে চতুষ্পদ দেখলেও বলবেন একটি ছাগলের তিনটি পা: 'বলা হয় যে গর্ভশাস্ত্র বা ভ্রূণ-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয়। জলে ভাসমান পাতা কিংবা কাঠের টুকরোর মধ্যে যে চ্যাটচেটে কালচে ভাব দেখা যায় তার কারণ ব্যাঙের ডিম ওখানে জমা হয়। কয়েকদিন পর ওই ডিমগুলি চ্যাপ্টা মাথা ছোটছোট লেজ-বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। এরপর এদের গলার কাছে মাছের কানকোর মতো শ্বাস নেবার থলি তৈরি হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি ঘটে ডিম্বাবস্থাতেই। এরপর বাচ্চাগুলি ডিমের আশ্রয় ছেড়ে জলে সাঁতার কাটতে থাকে, সে সময় ওই থলির মতো শ্বাসযন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বজায় রাখে। তখনও এদের শরীরে লেজ বর্তমান থাকে এবং দেখতে ছোট মাছের মতো লাগে। শীতকাল আসামাত্র কোনো বন্ধ-জায়গাতে গিয়ে তারা আশ্রয় নেয়। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তি হয় এবং শুরু হয় তার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। এরপর লেজ লুপ্ত হয়, সৃষ্টি হয় পা, ফুসফুস তৈরি হয়। কানকোর সাহায্যে শ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া, এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাণীদের নিজেদের উন্নতির জন্যে বিবর্তনের যে চক্র আছে তাকে সম্পূর্ণ করতে হয়। যে যে প্রজাতি থেকে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণী যেই অন্তিম যোনিতে পৌঁছায়, গর্ভস্থ অবস্থা থেকে বৃদ্ধি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ওই প্রাণীকে তার সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমা শেষ করতে হয়। মুরগির ডিমেরও প্রারম্ভ এক কোষী অ্যামিবা থেকে। এদেরও প্রাথমিক পর্যায়ে মাছের মতো শ্বাস ব্যবস্থা থাকে। ডিমের খোলার বাইরে আসার পরেও গলার কাছে তার চিহ্ন বর্তমান থাকে। এর দ্বারা এটাই অনুমান করা যায় যে পাখিরা মাছ এবং ব্যাঙের রূপ থেকে বিবর্তনের পথে পাখীতে পরিণত হয়েছে। যদিও গর্ভের পরিবর্তন-কাল খুবই সংক্ষিপ্ত, তথাপি তার মধ্যে পূর্বপুরুষের সমস্ত চিহ্নই ফুটে ওঠে। শূকর, গোরু, খরগোস, মানুষের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গর্ভ প্রায় একই ধাঁচে বিবর্তিত হয়। মানব গর্ভ মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখী ইত্যাদি আকারের পরিক্রমা সমাপ্ত করেই স্তন্যপায়ী অবস্থাতে এসেছে। এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে মানুষের ওই যোনির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। হয়ত লক্ষ বছর লেগেছে পরিক্রমা সমাপ্ত করতে কিন্তু এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষেরও উৎপত্তি অ্যামিবা থেকেই। এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এরচেয়ে বেশি প্রমাণ প্রকৃতি আর কি দেবে ? কীট জাতীয় প্রাণীরা প্রাথমিক অবস্থাতে সকলেই এক রকমের। সে সময় কে প্রজাপতি, কে ফড়িং আর কে ভ্রমর তা আলাদা করে বলা যায় না। প্রজাপতি এবং মথ তাদের বৃদ্ধিকালে অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করে, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়ের রূপ একই। এর দ্বারা উভয়ে যে একই বংশোদ্ভূত এবং নিজেদের পর্যায়ের পরিক্রমা সাঙ্গ করেছে তা প্রমাণিত হয়। গর্ভের বিকাশের ক্রম অনেকটা এ ধরনের —প্রথমে এক কোষ তারপর দ্বিকোষ, তারপর দুই থেকে চার এবং চার থেকে আট, আট থেকে ষোলো কোষীতে পরিণত হয়। কোষ সর্বদা দুইয়ের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এভাবে ডিমের বৃদ্ধিও দুই-এর অনুপাতেই ঘটে। অ্যামিবা এককোষী এবং হাইড্রা দ্বিকোষী প্রাণী। এভাবেই, গর্ভশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে প্রথমে সৃষ্টি হয় সরল শ্রেণীর প্রাণী, পরবর্তী পর্যায়ে জটিল শ্রেণীর প্রাণের সৃষ্টি হয়।'

এই প্রসঙ্গে ঋতম্ভরা, সত্য অনুসন্ধানী প্রজ্ঞা বলছে, 'উপযুক্ত যুক্তি দ্বারাও বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনুমানের ওপরেই বিবর্তনবাদের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে, পরীক্ষণের নামও নেই এর মধ্যে।'

'বেদ এবং পুরাণ-শাস্ত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই।'

'বেদান্ত মতে, জাগতিক তত্ত্ব ব্যতিরেকে, ব্যাপক আত্মা স্বতন্ত্রভাবে মান্যতা পায়।'

'কর্ম এবং উপাসনার সমন্বয়ে ব্রহ্মান্ত দেবলোক এবং শুধু কর্মের দ্বারা পিতৃলোকের প্রাপ্তি হয়। যারা কর্ম এবং উপাসনা দুই থেকেই ভ্রষ্ট, পাশবিক কাম, কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে নিরত, তাদের জন্য কীট পতঙ্গের যোনিতে জন্ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে।...এখানে জন্ম এবং মৃত্যু, উভয় যন্ত্রণাই কষ্টকরভাবে ভুগতে হয়। দ্বাপর, কলিযুগে রজোগুণ, তমোগুণের বিস্তার, পাপ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে ক্ষুদ্র জন্তুর বংশবৃদ্ধি হয়। ...ঈশ্বরীয়, শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ অনেক কিছুর পরিবর্তন তার নিজের অনুকূলে করতে সমর্থ হয়।

ঈশ্বর

ধর্মের মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বর থাকতে হবে, এমন ধারণা ভুল। বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে আশি কোটির চেয়ে কম নয়। এর মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যান্ড বর্মা এবং শ্রীলংকা পড়ে। ভারতবর্ষও এখন আর বৌদ্ধ শূন্য দেশ নয়। বিগত এক বছরে সামান্য সংখ্যক বৌদ্ধরা, চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষে পরিণত হয়েছে। এই মহান্ ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ১৯৩২ সালে লন্ডনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে সমস্ত ধর্মের এক মিলিত সভা আহ্বানের আয়োজন হচ্ছিল। তার প্রথম ধ্বনি ছিল : ঈশ্বরের সন্তানরূপে সমস্ত মানুষ ভাই ভাই। আমার বন্ধু ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন, বৌদ্ধদের প্রতিনিধি হিসেবে সেই সভায় আহূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত 'ঈশ্বর' শব্দটিকে প্রত্যাহার না করা হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো বৌদ্ধ সেই সভায় যোগদান করতে পারেন না। তাঁর কথা শুনে একজন কাদিয়ানি মুসলমান ভাই বিস্মিত হয়ে বলে ফেলেছিলেন —'হায় আল্লা, এমন ধর্মও তাহলে আছে যেখানে ঈশ্বর নেই।' প্রকৃত ঘটনা এই যে বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানে না। তাছাড়া শুধুমাত্র বৌদ্ধরাই কেন, জৈনরাও ঈশ্বর মানে না, কাশীপাত্রী মহারাজের বেদান্তও ঈশ্বর মানে না। ঈশ্বরের কাজ হলো জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করা। অদ্বৈত ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অতএব তার দ্বারা উপরোক্ত কোনো কাজই সম্ভব নয়। তবে সাধারণ মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্য অদ্বৈতবাদীরাও সমস্ত ধরনের অস্ত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করে থাকে তা করপাত্রী মহারাজের প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যায়। তিনি বলছেন : 'ঈশ্বর জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও পদ্মপত্রের মতো নির্লিপ্ত থাকেন' তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকেই 'প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থের মূল কারণ'ও বলে যাচ্ছেন।

'কোনো যন্ত্রের বিবর্তন যেমন কোনো সচেতন বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব তেমনি বিশ্বের বিকাশ বা বিবর্তন কোনো চেতন বা ঈশ্বরের দ্বারাই সম্ভবপর।'

'বস্তুত প্রাণীদের জাতি, আয়ু এবং ভোগ সবকিছু তার কর্মানুসারে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়'।

করপাত্রী মহারাজ এখানে যে ঈশ্বরের কথা বলছেন, তা তাঁর বেদান্ত মতে 'আকাশ-কুসুম', 'গর্দভের শিঙ' কিংবা 'বন্ধ্যার পুত্র সন্তানের' মতোই কাল্পনিক, বেদান্ত একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য তত্ত্ব বলে স্বীকার করে।

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

আর ব্রহ্ম নিষ্কল্প এবং নিষ্ক্রিয়।

এরপর তিনি বস্তুবাদী বিবর্তনবাদীদের প্রতি আক্ষেপ করে বলছেন : 'যখন প্রকৃতি সর্বত্রই উপস্থিত, যেখানে সর্বত্র জলবায়ু অনুকূলে, সেখানে কেন অ্যামিবা জন্মে নতুন কোনো প্রজাতির প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে না।'

প্রকৃতি ব্রহ্মের মতো কোনো এক বস্তু নয়। দেশে কালে তার অনন্ত প্রবাহ। সমস্ত জায়গার জলবায়ু অনুকূল হয় না। তাছাড়া অনুকূল জলবায়ু, অনুকূল পরিবেশেও কোনো কোনো প্রাণীর বিবর্তনে কোটি কোটি বছর লেগে যায়। যদি বিবর্তনবাদের মধ্যেও কোনো ঋষির ভূমিকা থাকত, তাহলে তাঁর বা তাঁদের মুখের কথা খসানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিকাশ প্রক্রিয়াই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যেত, করপাত্রী মহারাজদের মায়াবাদে বলা হয় : 'জড়-জগৎ ···কেবল প্রকৃতির গতিবিধির পরিণাম নয়, কিন্তু অখণ্ড সত্তা, অখণ্ড বোধ, পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার যে অঘটন পটিয়সী মায়াশক্তি আছে, তারই পরিণাম, মহত্তত্ত্বের অব্যক্ত তত্ত্ব ও তার কারণ হলো স্বপ্রকাশ, স্বতন্ত্র।'

যেমন আগেই বলা হয়েছে যে উপরোক্ত তত্ত্ব নিষ্ক্রিয়, অথচ এর বাইরে অন্য কোনো তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে গেলে অদ্বৈতবাদই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যখন মায়া ভ্রমেরই নামান্তর, তখন তার মধ্যে কিসের শক্তি ? আবার অখণ্ড বোধ বা সতত্ত্বের মধ্যে মায়া অথবা ভ্রম আসবে কিভাবে !

করপাত্রী মহারাজ তর্ক করতে করতে সমস্ত বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করেছেন, এবং খুঁজতে খুঁজতে অন্তিম মূল পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং তারপরই উল্টো-কথা বলছেন : 'অন্তিম মূলকে সমূল বলে ধরলে অনবস্থা দোষ ঘটবে। সে জন্যই একে অমূল মানাই আবশ্যক।'

এই কথার অর্থ হলো, সমস্ত বস্তুর কারণ খোঁজা অপ্রয়োজনীয়। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতের কারণ খুঁজতে খুঁজতে অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছে যাই। কোনো তার্কিক যেমন গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, তেমনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন —যদি সমস্ত বস্তুর পেছনে কারণ থাকাটা আবশ্যিক হয়, তাহলে ব্রহ্মের কারণ কি? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর ছিল, 'যদি তুই এমন তর্ক করিস তাহলে 'মূর্ধাতে বিপতিষ্যতি' (তোর মাথা খসে পড়বে)। কিন্তু এই উত্তরকে খুব যুক্তিযুক্ত, শিষ্ট বলা যাবে কি?

এরপর মহারাজ বলছেন: 'নির্বিকল্প সমাধি স্তরে ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।'

নির্বিকল্প সমাধি বুদ্ধও স্বীকার করেন। আর শংকরাচার্য বুদ্ধকে 'যোগীনাং চক্রবর্তী' আখ্যা দিয়েছিলেন। যদি নির্বিকল্প সমাধিতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তাহলে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী কেন হলেন? যাঁরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা রাত্রিতে কোথাও বিশেষ করে শ্মশান ইত্যাদি জায়গায় একা যেতে শংকা বোধ করেন, যেতে বললে ভীত হয়ে ভূত-প্রেতের দেখাও পেয়ে যান, নির্বিকল্প সমাধিতে ঈশ্বরের দর্শন অনেকটা এই জাতীয় ব্যাপার।

ঈশ্বর যদি এই দ্বন্দ্ব দুঃখময় জগতের কর্তা হন, তাহলে জগতে ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ই সিদ্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে, যদি সত্যি ঈশ্বর করুণাময় হতেন, দয়ামায়ার বিন্দুমাত্র তাঁর থাকত তাহলে তিনি এই দুর্দশার অন্ত করতেন। এর জন্য করপাত্রী মহারাজ বাদরায়ণের নিম্নোক্ত উক্তিটিকে আশ্রয় করতে পারেন।

'বৈষম্যনৈর্ঘৃণে ন সাপেক্ষত্বাত্'। (ব্রহ্মসূত্র)

অর্থাৎ—ঈশ্বরের ওপরে বিভেদ সৃষ্টি এবং নির্দয় হবার দোষ চাপানো চলে না, কারণ জীবের কর্মফল অনুসারে ঈশ্বর সুখ দুঃখ ইত্যাদি বণ্টন করে থাকেন। কিন্তু বাদরায়ণের এই উক্তিও কৌষীতকির উপনিষদের কাছে তুচ্ছ।

'এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি যমেভ্যো ঘো নিনীষতে।'

ঈশ্বর যাকে নীচে নামাতে চান, তাকে দিয়ে পাপ কর্ম করিয়ে নেন। কৃষ্ণের সীতাও এর ওপরে জোর দিয়েছে।

'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।'

যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীদের যন্ত্রের মতো ঘোরাচ্ছেন, তাহলে তার ওপরে বেচারাদের দিয়ে পাপ করিয়ে নিয়ে দণ্ড দেওয়াটা কোন ধরনের ন্যায়?

করপাত্রী মহারাজ এরপর বলছেন: 'ঈশ্বর যদি সত্য বস্তু হন, তাহলে কারও চাওয়া বা না-চাওয়ার দ্বারা তাঁর কিছুই যায় আসে না। ...ঈশ্বর এক স্বতঃসিদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বমান্য বস্তু। এই কথা আধুনিক গবেষণা, ন্যায়-সাংখ্য-বেদান্ত দর্শন, আস্তিক সিদ্ধান্তসমূহে এবং আস্তিকদর্শনে স্পষ্টত স্বীকৃত। ধর্ম এবং ঈশ্বর পরম সত্য বস্তু। এ জন্যই সর্বকালে এবং সর্বদেশে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়।'

ঈশ্বর বিশ্বাসীর দল ধর্ম এবং ঈশ্বরের নাম নিয়ে হাজার বছর ধরে রক্তের নদী বইয়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সময় এর রূপ আমরা দেখেছি। ঈশ্বর যদি সত্যিই থাকতেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের নৃশংস হত্যাকাণ্ড থামাবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিতেন। ন্যায়-বেদান্ত ঈশ্বর মানে, কিন্তু কপিলের সাংখ্যদর্শনকে ঈশ্বরবাদী বলাটা নেহাতই সত্যের অপলাপ।

করপাত্রী মহারাজের আগে উদয়নাচার্যও তাঁর 'কুসুমাঞ্জলী' গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রচুর যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধ লেখক তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে সে সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন। সে রকম কিছু উদাহরণ দিয়ে করপাত্রী মহারাজ বলতে চাইছেন যে, জগতের ব্যবস্থা, সূর্য চন্দ্রের মতো উপকারী বস্তু সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের বিশেষ গতি এবং এই পৃথিবীকে ধারণ করার দৃষ্টান্ত দেখলে মনে হয় এই সমস্ত ক্রিয়ার পেছনে একজন কর্তা অবশ্যই বর্তমান, আর তাঁর নাম ঈশ্বর। এই জগতে ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা দুই-ই রয়েছে।

পরমাণুর ভেতরে বিদ্যুৎকণা তার কক্ষপথেই ঘোরে আবার কখনো কখনো কক্ষপথ বিচ্যুত হয়। বিজ্ঞান এর সমাধান প্রকৃতির পরীক্ষার মাধ্যমেই করেছে। সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি তো ঋষিদের মতানুযায়ী দেবতা, তাদের বস্তু কিংবা পিণ্ড আখ্যা দিলে অপমান করা হয়। নীহারিকাপুঞ্জ থেকে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহপিণ্ডের সৃষ্টি, আধুনিক বিজ্ঞান এ কথাই বলে। সূর্য চন্দ্রের গতি জানবার জন্যও কোনো ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী এবং সৌরজগতের সমস্ত অগ্নিপিণ্ডই গতি এবং আকর্ষণের দ্বারা ধাবিত হচ্ছে। ঋষিগণ অবশ্য এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঈশ্বর-ধারণায় সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ নাগের ওপর পৃথিবীর অবস্থানের কথাও বলেছেন। করপাত্রী মহারাজের উদ্দেশে একটা কথাই বলা যায় যে মানবজাতি তার শৈশবকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, সেই ফেলে-আসা শৈশব ঘুমকে ফিরিয়ে আনার বৃথা চেষ্টা আর করবেন না।

আত্মা

বৌদ্ধগণ অনাত্মবাদী হওয়ার জন্যই আত্মাকে স্বীকার করেন না, এছাড়া প্রায় সমস্ত ধর্মই আত্মাকে একটি নিত্য বস্তু বলে স্বীকার করে। মার্কসীয় দর্শনও কোনো আত্মাকে স্বীকার করে না। মার্কসবাদও বৌদ্ধদের কথায় বলতে পারে: 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং' (যা সত্য বস্তু তা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, যা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল নয় তা সত্য বস্তুও নয়) আত্মা যদি ক্ষণে ক্ষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তনশীল বস্তু হয়ে থাকে, তবে তা করপাত্রী মহারাজদের স্বীকৃত আত্মা হতে পারে না, আবার অপরিবর্তনশীল আত্মাকে আধুনিক বিজ্ঞান, বৌদ্ধ এবং মার্কসবাদীরা স্বীকার করে না। এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য : 'শরীরের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির নিবৃত্তি এবং সাক্ষীর অনুবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে। আত্মা এবং পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় কোনো কাল্পনিক কিছু নয়, প্রমাণিত সত্য।'

'শরীর-বিচ্ছিন্ন আত্মার অস্তিত্ব কোনো দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় না, বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হলে মানুষের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। এভাবে হাজারও লোককে মারা যেতে দেখা গেছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হাতে-নাতে দেখিয়ে দিয়েছে যে হৃদস্পন্দন কোনো উপায়ে যদি আবার সক্রিয় করে দেওয়া যায় তাহলে ওই দেহে আবার জীবনের সঞ্চার হয়। বস্তুত অকাট্য ঋষি-বাক্য অনুসারে ওই ব্যক্তির যম-দরবারে হাজির হবার কথা, কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির ফলে আবার সে জীবন ফিরে পেল। বন্ধ ঘড়ির কোনো একটা দুটো কলকব্জা ঠিক করে দিলে ঘড়ি আবার চলতে শুরু করে। ঠিক সে রকমই এখানেও বন্ধ হৃদস্পন্দন চালু করে দিতেই জীবন প্রবাহও সক্রিয় হয়েছে। বিদ্যুৎ স্পর্শে মানুষের হৃদয়ের গতি স্তব্ধ হয়ে মানুষ মৃতে পরিণত হয়েছে, একথা চিকিৎসা বিজ্ঞান মানে। চিকিৎসকরা পরলোকে প্রবেশের অধিকারী নন যে, সেখান থেকে কোনো আত্মাকে এনে এই মৃত শরীরে স্থাপন করবেন। জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্ত সকল অবস্থাতেই কিন্তু জীবনপ্রবাহ সচল থাকে। একেই করপাত্রী মহারাজ আত্মা বলে চালাতে চাইছেন। বস্তুত মন ব্যতীত আর কোনো আত্মা প্রমাণ করা যায় না। বৌদ্ধগণ তো মনকেই 'চিত্ত' কিংবা 'বিজ্ঞান' বলে থাকে।

করপাত্রী মহারাজ আত্মাকে স্বীকার করিয়ে তাকে পুনর্জন্মের সঙ্গে জুড়ে দিতে চান।

'স্পিরিচুয়ালিজমের (আধুনিক পরলোকতত্ত্ব) পণ্ডিতগণ জীবের অস্তিত্ব এবং তাদের জন্মান্তরকে মেনে নেন।'

করপাত্রী মহারাজ ইংরেজী শব্দ স্পিরিচুয়ালিজম্ ব্যবহার করে ভেবেছেন এটাকে বিজ্ঞান বলে চালানো যেতে পারে। ইউরোপেও ওঝা-গুণীনের দল একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। তাই এতই প্রয়োজন যদি মনে করেন তবে তিনিও স্বদেশী অলৌকিক বিদ্যার প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন : 'কোনো কোনো নিত্য আত্মা আছে যারা জন্মজন্মান্তরের শুভাশুভ কর্মফল অনুসারে উত্তরোত্তর জন্মগ্রহণ করে থাকে।'

পোঁটলাতন্ত্রের চোরাকারবার, ফাটকাবাজি, ঘুষখোরী ইত্যাদি অনেক কুকর্ম দ্বারা স্ফীত পোঁটলাটিকে সুন্দর আবরণে ঢাকবার জন্যই এই কর্মবাদের তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু এই কর্মফলের ভার বহনের জন্য বৌদ্ধদের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত্য আত্মার সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। করপাত্রী মহারাজের আত্মা নিষ্কলুষ নির্মল এবং নিত্য। এ রকম একটি বস্তুর ওপর সমস্ত শুভ অশুভের প্রভাব কিভাবে পড়বে? আত্মা যদি গতিশীল, পরিবর্তনশীল হতো তাহলেও নয় কথা ছিল।

'স্বপ্ন এবং স্মৃতিজ্ঞানের প্রসঙ্গে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে দেহাদির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে অভৌতিক আত্মাই দ্রষ্টা হবে, দেহাদি নয়।'

মহারাজ, শুধু দ্রষ্টা বললেই কি কার্যসিদ্ধির হবে? তাকে ভোক্তাও বলুন! আবার বৈদান্তিকদের পক্ষে ভোক্তা বলাও অসুবিধাজনক, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের অংশটাই বেশি, কারণ তখন স্বপ্ন, মায়া (ভ্রম) সবাই সমান ভোক্তা বলে পার পাওয়া মুস্কিল।

অভ্রান্ত শাস্ত্রকর্তা ঋষিদের মধ্যেও অনেক নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। সে কথা করপাত্রী মহারাজও মানবেন।

'নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যরাও···ঈক্ষণকে গৌণ এবং নিয়মরক্ষার বস্তু হিসেবেই নির্ণয় করেছেন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

মায়াবাদ দর্শন

শংকরের বেদান্তকেই মায়াবাদ বলা হয়। শংকর এক ব্রহ্মকেই প্রকৃত তত্ত্ব বলে মানতেন। এর বাইরে সমস্ত বস্তু, বিশ্ব সংসারকে মনে করতেন মায়া। যদিও উপনিষদে ব্রহ্মকে স্বীকার করা হয়েছে, তবুও উপনিষদের পরস্পর বিরোধী মতের সমাধান সূত্র হিসেবে বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। শংকরাচার্য ব্রহ্ম-সূত্রকে ব্যাখ্যা করে তাকে মায়াবাদের সমর্থনে আনতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র এ-বিষয়ে শংকরের সহযাত্রী হতে রাজি হয়নি। শংকরের মতে জীব ব্রহ্মই, যেটুকু পার্থক্য আছে, সেটুকু মায়ার প্রভাবে। জীব স্বতঃমুক্ত অতএব তার মুক্তির কথা বলা অবান্তর। জীবনে অথবা মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু বাদরায়ণ মুক্ত জীব মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্মের সঙ্গে কেবল ভোগের অবস্থাতে সাম্য (সমানতা) একথা স্বীকার করেন, অন্য কোনো বিষয়ে নয়।

বস্তুত শংকরের অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই এক বিকৃত রূপ। বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদী সদ্‌ভূত তত্ত্বকে বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে তাকে ক্ষণিক বলে স্বীকার করেন। এই রকম বিজ্ঞানে (চিত্ত) প্রতিমুহূর্তে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটার কারণকে মায়া অথবা অধ্যাস (ভ্রম) বলার প্রয়োজন নেই। ওগুলি ঢেউয়ের মতো অনন্ত বিজ্ঞান-সমুদ্রে অনবরত উঠছে এবং সেই প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্যে জগতের সৃষ্টি, বৌদ্ধরা একথা মানতো। শংকরাচার্যের মতানুযায়ী তাঁর দর্শনের মহাপ্রতিষ্ঠাপক ছিলেন গৌড়পাদ। যদিও শংকর কোথাও একথা স্বীকার করেননি যে তিনি বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের কাছে ঋণী ছিলেন, কিন্তু গৌড়পাদ সে কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন :

'জ্ঞানেনাকাশকল্পেনধর্মান যো গগনোপমান।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধ তং বন্দে দ্বিপদং বরং।' (আগমশাস্ত্র)

অর্থাৎ —জ্ঞেয় থেকে অভিন্ন, আকাশের সমান বিস্তৃত জ্ঞানের সাহায্যে যিনি গগনোপম ধর্ম-(সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত ধর্ম) বোধ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই সমস্ত দ্বিপদচারীদের মধ্যে তথাগত (বুদ্ধ)-কে আমার প্রণাম।

'অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ধর্মাঃ প্রকৃতিনির্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুদ্ধয়ন্তে ইতি নায়কাঃ॥' (আগমশাস্ত্র)

অর্থাৎ —যত ধর্ম (চিত্ত বিষয়, পদার্থ) আছে, তার সবকটিই প্রকৃতিগতভাবে নির্মল এবং কারণ রহিত। এসব আদি থেকেই জ্ঞান রূপ (বুদ্ধ), আর এই-ভাবেই নির্বাণের (মোক্ষ) মধ্যে এই তত্ত্ব বুদ্ধ (নায়ক) জানেন।

গৌড়পাদ তাঁর আগমশাস্ত্রে বুদ্ধের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশংসা ও প্রণাম জানিয়েছেন। শুধু প্রণামই নয়, সিদ্ধান্ত থেকেও গৌড়পাদকে বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের অনুগামী বলা যায়। তাঁর রচিত 'মাণ্ডুক্যকারিকা' বা 'আগম-শাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছদের নাম অলাতশান্তি। অলাত মানে বনেঠি*, যাতে গতিকে স্থির চক্রের মতো দেখা যায়। অলাত উপমাটিও ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদের অনুকূলে। আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গৌড়পাদ বলেছেন :

'ঋজুবক্রাদিকাভাসং অলাতং স্পন্দিতং যথা।
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানং স্পন্দিতং যথা ॥' (আগমশাস্ত্র)

অর্থাৎ —যেভাবে ঘোরানোর ফলে বনেঠি (অলাত) সোজা কিংবা বাঁকা যে-রকম অবস্থা প্রতীত হয় সেরকম বিজ্ঞান (চিত্ত) স্পন্দিত হলে গ্রহণ (বিষয়) তথা (বিষয় সমূহকে) গ্রাহক চিত্তের রূপ নিয়ে প্রতীত হয়।

চিত্ত অথবা বিজ্ঞান শংকরের বেদান্ত ভাষ্যে কূটস্থ অচল, নিত্য-অচল কিন্তু গৌড়পাদ এ বিষয়ে বলছেন :

'চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্ দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যং অসঙ্গ তেন কীর্তিতং ॥' (আগমশাস্ত্র)

অর্থাৎ —এই যে গ্রাহ্য গ্রাহক দ্বিভাব, এটি কেবল মাত্র চিত্তস্পন্দন। এজন্যই চিত্তকে নির্বিশয় নিত্য এবং অসঙ্গ বলা হয়েছে।

গৌড়পাদকে শংকরাচার্যের পিতামহপ্রতিম গুরু বলা হয়। যদিও মহামহো-পাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্যের গবেষণায় জানা গেছে যে গৌড়পাদ এবং শংকরের মধ্যে কালের ব্যবধান এত বেশি যে এই পর্যায়ে একজন গুরুই যথেষ্ট হতে পারে না। শংকরের মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়।

গৌড়পাদকে শুধু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলাটা যথেষ্ট নয় কারণ তিনি সিদ্ধান্ত এবং সম্মান উভয় বিষয়ে বুদ্ধকেই অনুসরণ করেছেন। শংকর নিজেকে পূর্ণ আস্তিক এবং বৈদিক পথের অনুসারী দেখাতে চেয়েছেন। সেজন্যই তিনি চিত্তস্পন্দন এবং অলাতবৎ (স্থির চক্র) চিত্তভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে নিত্য চিত্তভাব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেন, যা অবশেষে উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এতদ সত্ত্বেও বহু মীমাংসক তাঁকে (শংকরকে) অর্ধ বিজ্ঞানবাদী মনে করেন। রামানুজভাষ্যের টিকা শ্রুতপ্রকাশিকা তাঁকে বৌদ্ধদের সারিতেই দাঁড় করিয়েছে :

'বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগময়োঽনৃতো, প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বৌদ্ধোঽনৃতো বুদ্ধি-ফলে তথা হনৃতে, স্বয়ং চ বৌদ্ধশ্চ সমান সংসদঃ ॥'

অর্থাৎ—বেদ মিথ্যা, বুদ্ধরচিত আগম মিথ্যা। এই বেদ আর ওই আগমের

* একটি লাঠির দুই মাথায় কাপড়ের গোলক বেঁধে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ঘোরানো হয়। দূর থেকে ঘূর্ণায়মান লাঠিটিকে স্থির চক্রের মতো মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রামাণ্য মিথ্যা। জ্ঞাতা (আত্মা) মিথ্যা। জ্ঞান এবং তার ফল (মুক্তি) মিথ্যা। অতঃপর তুমি (শংকর মতাবলম্বী) এবং বৌদ্ধ এক পথের পথিক।

এখানে রামানুজী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ-শূন্যবাদের সঙ্গে শংকরের মতের তুলনা করে উভয়কেই এক বলছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। শংকর তাঁর পরমগুরু গৌড়পাদের অলাত চক্রবৎ স্পন্দনশীল বিজ্ঞানকে একান্তই বৌদ্ধদর্শনের সিদ্ধান্ত মনে করে ত্যাগ করেন, পরিবর্তে নিত্য বিজ্ঞানবাদ তত্ত্বে আস্থাশীল হন। বিজ্ঞান (ব্রহ্ম) নিত্য হলে অধিকারী হবে, অতএব তার মধ্যে পরিবর্তন এনে জগৎ সৃষ্টি হতে পারে না। যেটা বৌদ্ধ এবং হেগেলীয় দর্শনে হওয়া সম্ভব। সেজন্য শংকরকে মায়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। মায়া যদি কোনো বাস্তবিক তত্ত্ব হয়ে থাকে তাহলে অদ্বৈতবাদের অন্ত সুনিশ্চিত। সেজন্যই আবার তাকে অনির্বচনীয় বলা হয়েছে। কিন্তু অনির্বচনীয় বললেই কার্যোদ্ধার হবে না। এখানে বলতে হবে বিশ্বের মূলবস্তু যা মায়া, তা বাস্তবিক না রজ্জুতে সর্পভ্রম। শংকর বেদান্ত থেকে কাশ্মীর শৈবদর্শন বরং অনেক যুক্তিপূর্ণ, কারণ সেখানে পরমতত্ত্ব অদ্বৈত বিজ্ঞানকে স্পন্দনশীল স্বীকার করা হয়েছে।

করপাত্রী মহারাজের মান্য দর্শনের ঐতিহাসের প্রতি কিঞ্চিত আলোকপাত করে এবার আমরা তাঁর বক্তব্য নিয়ে আলোচনায় যেতে পারি : 'ভারতীয় দর্শনে যদিও খুব বেশি বিরূপতা নেই কারণ তার প্রত্যেকটির মূল হলো, অনাদিপৌরুষেয় বেদ এবং বেদ বিষয়ক শাস্ত্র, যোগ সমাধি দ্বারা লব্ধ পরমেশ্বরীয় প্রজ্ঞা এবং লৌকিক প্রত্যক্ষাণুমানি। তথাপি এখানেও সর্ব বিষয়ে সমস্ত ঋষির ভাবনা এক সদৃশ নয়, উপরন্তু এক এক বিষয়ে এক একজন ঋষি ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির মাধ্যমে তত্ত্বানুভূতি লাভ করেছেন সেই বিষয়ে সেই ঋষিই সার্বভৌম। যেমন শব্দ বিষয়ে পাণিনি, কাত্যায়ন পতঞ্জলি প্রমুখ আবার বাক্য বিচারে জৈমিনি, ব্যাস ইত্যাদি।'

ভারতীয় দর্শনে বিরূপতার আধিক্যই বেশি, যেটাকে করপাত্রী মহারাজ কম করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। ব্রাহ্মণের দুটি স্বীকৃত দর্শনের মধ্যে তিনটি—সাংখ্য, বৈশেষিক এবং মীমাংসা—ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সমস্ত ভারতীয় দর্শন আলোচনা করলে নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। বৌদ্ধ আর জৈন দর্শন তো অপৌরুষেয় বেদ আর ঈশ্বরকে সরাসরি অস্বীকার করে। চার্বাক সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই নেই, তিনি ছিলেন ঘোর বস্তুবাদী, ঋষিদের মধ্যে প্রায়শঃই কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্য নেই। বোধহয় এজন্যই সংস্কৃততে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে : 'বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নৈকো মুনির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।'

বুঝতে পারছি না হঠাৎ করপাত্রী মহারাজ সমস্ত ভারতীয় দর্শন নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লেন কেন? যেভাবে মহারাজ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজন প্রবেশের বিরুদ্ধে ধরনা দিতে গিয়ে স্বপক্ষে মাত্র কয়েক জনকে পেয়েছিলেন, যেভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থন করে মুষ্টিমেয় কয়েক জন, এ রকম অবস্থা সে কালেও ছিল। মহারাজ অবশ্য এতেও ক্ষান্ত নন: 'ভারতীয় দর্শনের অন্তিম উদ্দেশ্য দুঃখ-নিবৃত্তি, মৃত্যুঞ্জয় হওয়া এবং মোক্ষ প্রাপ্ত করা, গৌণ অংশের মধ্যে অর্থ-কাম-ধর্ম র্জনও আছে।'

চার্বাক দর্শন ঠিক এর বিপরীত। চার্বাক ইহ সংসারই সুখের প্রত্যাশী আর কপিলের মতে মোক্ষ পরলোক ইত্যাদি সবই পুরোহিতদের মনগড়া ব্যাপার। সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। বৌদ্ধরা, নির্বাণকে প্রদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করে। করপাত্রী মহারাজের দর্শন দুঃখ নিবারণে ব্রতী, কিন্তু দাস, শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের দুঃখ তাঁর দুঃখ নয়।

মহারাজ উপনিষদ উদ্ধৃত করে বলছেন: 'একোঽহং বহুস্যাম: একের মধ্যে অনেক হয়ে ব্যক্ত হওয়া।' যেখানে উপনিষদের সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের সম্পর্ক আছে সেখানে তারা করপাত্রী মহারাজের মতো ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় এবং নিরীহ মনে করে না, তারা ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকে মায়া (ভ্রম) বলেও মনে করে না। এখানে তো প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকেই জগৎ রূপে মানা হয়েছে।

'মীমাংসকগণ বলেছেন 'ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ' —অর্থাৎ এই জগৎ কখনও এমন ছিল না, যেমন আজ নেই, অর্থাৎ জগৎ সদাই এ রকমই ছিল, সমস্ত গতিই তীরের গতির মতোই ভ্রমাত্মক।

এই ভ্রান্তিপূর্ণ জগৎ থেকে করপাত্রী মহারাজ যাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন তা সবই ভ্রান্তিপূর্ণ হবে। তাঁর তো কাশীর মন্দিরে হরিজন প্রবেশকেও এক ধরনের ভ্রম মনে করা উচিত ছিল। মনে হয় মহারাজ তাঁর মহান্ গুরু শংকরের বাণীতেও ভরসা করতে পারছেন না: 'ন বর্ণা ন বর্ণাসমাচার ধর্মা (বর্ণ কোনো কিছু নয়, বর্ণাশ্রম ধর্মও কোনো কিছু নয়) জগৎ কখনও এক ছিল না, তার মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু অনেক সময় কার্য তার কারণের সদৃশ হয়, তার ফলে উভয়কে এক মনে হয়।

যেখানে সুবিধা হবে সেখানে করপাত্রী মহারাজ বেদ-শাস্ত্রের উদাহরণ দেবেন। কিন্তু এটাই রহস্য যে 'শ্রুতপ্রকাশিকার' লেখকের বক্তব্য অনুসারে শংকর বেদান্তীদের কাছে বেদও মিথ্যা। সেভাবে মহারাজ আবার প্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের দোহাইও দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অনুমানের অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে বলছেন:

'যত্নে নানুমিতাঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ত তরৈরন্যৈর্যবোপপাদ্যতে॥'

অর্থাৎ —কুশল অনুমানী ব্যক্তিরা বহু প্রযত্ন করে যে অর্থকে তর্কসিদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, সেই অর্থকেই অন্য অনুমানী তার্কিক তার নিজের অনুমান তর্ক দ্বারা অন্যত্র সিদ্ধ প্রমাণ করে।

মার্কসবাদ এবং বহুলাংশে বৌদ্ধদর্শনও মগজ ধোলাই করা সিদ্ধান্ত বা যুক্তিকে স্বীকার করে না। তারা এমন অনুমানকেই স্বীকৃতি দেয় বস্তুজগৎ থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়। আচার্য ধর্মকীর্তি এজন্যই বলেছেন 'প্রমাণমভিসংবাদি জ্ঞানম্' অর্থাৎ, প্রমাণ সেই বস্তু যা পদার্থের বিকৃতি সাধন করে না। বিজ্ঞান তর্কসিদ্ধ বিষয়কে প্রমাণ স্বীকার করে না, তারা প্রয়োগ প্রামাণ্যতার দ্বারা লব্ধ তথ্যকেই মহাপ্রমাণ স্বীকার করে। গবেষণাগারে একজন বিজ্ঞানী কয়েক শত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হয়ত একটি তথ্য বা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সমর্থ হন, কিন্তু তাকে ততক্ষণ সর্বজনগ্রাহ্য বলা হয় না যতক্ষণ অন্য বিজ্ঞানীগণ অন্য জায়গায় সেই একই পরীক্ষা একাধিকবার চালিয়ে তাকে প্রমাণ করতে সমর্থ হন। সেজন্যই বলা যায় যে, সিদ্ধান্ত তর্ক বা অনুমানের অধীন নয়, বরং বস্তুর অধীন। বস্তুত, বস্তুই অন্তিম প্রমাণ। এ জন্যই ধর্মকীর্তি বলেছেন : 'যদিদং স্বয়মর্থানাং রোচতে তত্র কে বয়ম্।'

অর্থাৎ—যদি বস্তুর পক্ষপাতিত্ব এদিকেই থাকে তাহলে অন্যের এর মধ্যে অযথা নাক গলিয়ে কি লাভ ?

বেদ প্রামাণ্য

পুরোহিত এবং ধর্মাচার্যের দল চিরকালই বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধিতা করে আসছে। কারণ তাদের একটাই উদ্দেশ্য থাকে, যাহোক করে কিছু গুছিয়ে নেওয়া। যদি সকলে সব কিছুকেই বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা শুরু করে, তাহলে বেচারাদের রুজি রোজগারই বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্যই এরা চোখ বন্ধ করে বিনা ওজর আপত্তিতে বেদ-পুরাণ অনুসরণ করার কথা বলে। বেদ সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে খুব কম ধর্মাচার্যই আছেন, যাঁরা একে সম্পূর্ণরূপে দেখেছেন বা জেনেছেন। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকের কাছেও বেদের ছন্দ রীতিমতো লোহার কড়াই ভাজা চিবানোর মতো ব্যাপার। করপাত্রী বলছেন : 'বেদ প্রমাণ্যবাদীরা বলেন যে প্রয়োগ এবং বিবেকের ভিত্তিতে বেদোক্ত অর্থ সমূহের সৌষ্ঠব এবং সত্যতা প্রমাণ করা যায়। সেই ভিত্তিতে বেদের অর্থের ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে।'

বেদের প্রামাণিকতার খণ্ডন বৌদ্ধরা যেভাবে করেছেন তারপর অন্য কোনো প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ধর্মকীর্তি 'বেদ স্বতপ্রমাণ' তত্ত্বে বিশ্বাসীদের বুদ্ধিহীন জড়ত্বের পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে সামিল করেছিলেন :

'বেদপ্রামাণ্যং কস্যচিৎকর্তৃবাদঃ স্নানে ধর্মেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ।
সংতাপারংভঃ পাপহানায় চেতি ধ্বস্তপ্রজ্ঞানাং পংচলিংগানি জাড্যে ॥'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ—বেদের (গ্রন্থ) প্রামাণিকতা, কোনো (ঈশ্বর) সৃষ্টি কর্তার কর্তৃত্ববাদ, স্নানে ধর্মের ইচ্ছা, জাতিবাদের (ছোট বড় জাতপাত) অহংকার এবং পাপ দূর করার জন্য শারীরিক সন্তাপ দেওয়া (উপবাস এবং শারীরিক তপস্যা করা)—এই পাঁচটি আক্কেল খোয়ানো লোকের মূর্খতারই প্রমাণ।

বেদকে অপৌরুষেয় বর্ণনা করে জৈমিনি বলতে চেয়েছেন যেহেতু সমস্ত পুরুষেই অজ্ঞানতা, রাগ, দ্বেষ থেকে থাকে, এজন্য কোনো পুরুষের রচনাকে মানা চলে না, বেদ পুরুষকৃত নয়। কারণ তার কর্তাকে কেউ বলতে পারে না। অপৌরুষেয় হওয়ার কারণেই তা অভ্রান্ত। ধর্মকীর্তি লিখেছেন যে, গ্রামেগঞ্জে এমন বহু পুরানো অব্যবহৃত কুয়ো পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেগুলির নির্মাণ কে করেছিলেন কারো জানা নেই। কিন্তু সেজন্য ওগুলিকে কেউ অপৌরুষেয় বলে দাবি করে না। বস্তুত ঋষিগণ —ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, বামদেব —ইত্যাদি বেদের স্রষ্টা। বেদ রচনার পাঁচ দশ বছর পর পালি সূত্রে, ঋষিদেরই বেদমন্ত্রের কর্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কোনো বিজ্ঞানী অথবা মার্কসবাদী নিজেকে সর্বজ্ঞ বলে দাবি করে না। কিন্তু করপাত্রী মহারাজ তাঁর পছন্দ মতো অনেক ঋষিকে সর্বজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। অবশ্য তাঁর এ রকম কথাবার্তা আর আকাশে ঢিল ছোঁড়া একই ব্যাপার: 'এক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্মাণ্ড গোলকে অবস্থিত প্রাণী সর্বজ্ঞ হবার দাবি করে, এটা দুঃসাহসেরই নামান্তর মাত্র।...জড়বাদীদের কল্পনার মধ্যেও পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল মতভেদ বর্তমান।'

চার্বাক এবং মার্কসের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে ঋষি করপাত্রী বলছেন: 'চার্বাক এবং তার অনুগামী মার্কস ইত্যাদি বস্তুবাদীগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রমাণে বিশ্বাস করে না।'

যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ সিদ্ধ, সেজন্যই একে শুধুমাত্র চার্বাক এবং তার অনুগামী মার্কসই নয়, বৌদ্ধ দার্শনিকগণও প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মেনেছেন। অনুমানের সেই অংশটিকেই তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, যে অংশের সমর্থন প্রত্যক্ষরূপে পাওয়া যায়।

'কোনো সাধনের সিদ্ধির জন্য প্রমাণ আপেক্ষিক মাত্র।'

কিন্তু মায়াবাদীদের কাছেই বা কি প্রমাণ আছে, যে তারা সমস্ত জগৎ এবং তার সমস্ত বস্তুকেই মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। বিজ্ঞানীরা আর কিছু না হোক প্রয়োগ অথবা প্রত্যক্ষকে অন্তত প্রমাণ বলে থাকে।

করপাত্রী মহারাজের সঙ্গে কিছু বিতর্ক

অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের তর্ক করার বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। কারণ তাঁরা শুধুমাত্র তর্কের ভিত্তিতে বিশ্বজগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। মার্কস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদীরা বৈদান্তিকদের বহুকালের সযত্ন-লালিত ভ্রান্তিবিলাসকে এক মুহূর্তে এই বলে খণ্ডন করে যে —যে মুহূর্তে তারা (বৈদান্তিকেরা) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রুটির দিকে হাত বাড়ায় বা ঘুমের জন্য বিছানার আশ্রয় খোঁজে, সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই নিজেদের মতের বিরোধিতা করে ফেলে, কারণ বেদান্ত মতে জগতের সমস্ত কিছুই মায়া বা ভ্রম। ক্ষুধা কিংবা নিদ্রাও তাদের মতানুযায়ী মিথ্যা, আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

জগৎকে মিথ্যা আখ্যাদানকারী করপাত্রী মহারাজ সাংখ্যের সৎকার্যবাদের ঘোরতর সমর্থক, যে অনুসারে কারণ-সামগ্রী, আবরণ ···ইত্যাদি সরিয়ে কার্যকে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। যেমন তিল থেকে তেল, দুধ থেকে মাখন, তন্তু থেকে সুতো। বালি থেকে তেল কিংবা আকাশ থেকে তন্তু অথবা পাটের সাক্ষাৎ বিবর্তন কখনোই সম্ভব নয়। ···বেদ এবং গীতা এজন্যই সৃষ্টির বারংবার আবির্ভাব স্বীকার করে: 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বকল্পয়ত্'। (পূর্ব সৃষ্টির মতোই বিধাতা উত্তরোত্তর সৃষ্টিতেও সূর্য চন্দ্র ইত্যাদির বিধান রাখেন।)

সাংখ্যের মত হলো মূর্তি শ্বেতপাথরের মধ্যেই মজুত ছিল, ভাস্কর তা থেকে আবরণরূপী অতিরিক্ত পাথর সরিয়ে দেয় এবং মূর্তি প্রকাশিত হয়। এভাবেই সারা সৃষ্টি রচিত হয়ে চলেছে। করপাত্রী মহারাজ অবশ্য বালি থেকে তেল বের করার পক্ষে, কারণ ব্রহ্মের মধ্যে মিথ্যা কল্পিত জগৎ বালির মধ্যে তেলের মতোই ব্যাপার। বৌদ্ধদার্শনিকগণ সাংখ্যের সৎকার্যবাদের* বিরুদ্ধে অসৎকার্য-বাদের সমর্থন করে। মার্কসও এ-বিষয়ে বৌদ্ধদের মতকেই সমর্থন করেন। কারণ থেকে কার্য সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। দুজনের সম্পর্ক এটাই যে কারণ (কারণ-প্রবাহ) নষ্ট হয়ে গিয়ে সে জায়গায় কার্য-প্রবাহ ক্রিয়াশীল হয়। যেহেতু কার্য সর্বদাই তার কারণের সঙ্গে সদৃশ হয়ে থাকে, সেজন্যই উভয়ের মধ্যে একতার ভ্রান্তি হয়ে থাকে। একথা সর্বমান্য যে, কারণের মধ্যে বা কারণসমূহের মধ্যে যে বস্তু সৃষ্টির সামর্থ থাকে, সেটাই তার দ্বারা সৃষ্ট হয়। বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বটবৃক্ষ সৃষ্টির শক্তি নিহিত আছে, আর বীজ নিজে বিনষ্ট হয়ে বটবৃক্ষের রচনা করে। সেজন্য যদি একথা কেউ বলে যে সরষের দানা পরিমাণ বীজের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষটি মজুত ছিল, তাহলে সে কেবল উপহাসের পাত্রই হবে।

এরপর মহারাজ বলছেন : 'অচেতন কদাপি চেতন হতে পারে না।'

যদি অচেতন চেতন হতে না পারে তবে চেতনই বা অচেতন হবে কিভাবে ? কিভাবে অখণ্ড বোধ স্বরূপ ব্রহ্ম জগতে পরিবর্তিত হয়ে গেলো ? উত্তরে

---

* কার্যের মধ্যে পূর্ব হতেই সঞ্চিত পূর্ণরূপ কারণকে স্বীকার করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি কেউ বলে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে মিথ্যা মায়া থেকে, তা হবে নিছকই বাগাড়ম্বর।

ইতিহাস এবং ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বস্তুর ভিত্তিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে। এ সম্বন্ধে করপাত্রী মহারাজের বক্তব্য : 'ইতিহাস স্বয়ং কোনো সিদ্ধান্তের ধারক বা প্রতিবন্ধক হতে পারে না। গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞানে এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে, যা পরস্পর বিরোধী।'

বিজ্ঞান প্রয়োগসিদ্ধ তত্ত্বকেই সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকার করে। যা সর্বত্র প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ করা যায়, একমাত্র তাকেই তারা মানে। পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে তারা সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকার করে না।

কিন্তু মহারাজ বিজ্ঞানের ওপরে তেমনই ক্ষিপ্ত, যেমন ক্ষিপ্ত ষাঁড় লাল কাপড় দেখলে হয়। সে জন্যই বলছেন : 'জড় বস্তুকেই সত্য মানা হয়েছে। তাকে অযথা বস্তু মানা ভ্রান্তির পরিচায়ক। ...পরমেশ্বরীয় প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত পরমার্থ সত্য জ্ঞানের অপলাপ করা চলে না। ... প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক বিহীন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই নয়, তা খানিক অজ্ঞানতা আর খানিক আত্মাভিমান।'

মায়াবাদীদের জগতের মিথ্যা বস্তু থেকে কিই বা দেনা-পাওনা আছে। কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানের সম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে একমত নন।

'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতায়ো বিভিন্নাঃ নৈকো মুনির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।'

মায়াবাদ

যদিও জগৎ তিন কালেই অসত্য, অবাস্তব, মিথ্যা, কল্পিত—এটাই করপাত্রী মহারাজের বেদান্তের সিদ্ধান্ত —তথাপি তাঁরা বলেন : 'বস্তুত সত্যতার নির্ণয় হতে পারে একমাত্র প্রমাণের দ্বারাই, কারণ প্রমার (যথার্থ জ্ঞান) কারণকেই প্রমাণ বলা হয়, আর অজ্ঞাত, বাধাহীন, অসন্দিগ্ধ বিষয়ের জ্ঞানকেই প্রমা শব্দ দ্বারা বোঝানো যায়। এই প্রমার কারণকেই আমরা প্রমাণ বলে থাকি।'

প্রমা অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞান আর তার কারণ প্রমাণ কূটস্থ (নিত্য) অদ্বৈতবাদে কখনোই সম্ভব নয়, কারণ তাদের কাছে জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক বিষয়ই মায়াবাদের সিদ্ধান্তে নিছক ভ্রম।

সেজন্যই এরপরও মহারাজ যা নিবেদন করছেন তাও যথার্থ নয় : 'বেদান্ত মতানুসারে বিনাশ অথবা ধ্বংসের অঙ্কুরকেই কারণ হিসেবে মানা হয় না, কিন্তু বীজের অবয়বই অঙ্কুরের রূপে পরিবর্তিত অথবা বিবর্তিত হয়।...কোনো কার্য বিনাশলাভ করলে তা থেকে কোনো ভালো জিনিস সৃষ্টি হয় না।...বস্তুত মার্কস হেগেলের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে প্রয়োগ করেছেন।'

বেদান্ত (শংকর) মতে বিনাশ বা বিধ্বংস কোনো বিষয়ই হতে পারে না, কারণ জগৎ তাদের কাছে শশশৃঙ্গ কিংবা আকাশকুসুমের মতোই অলীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেগেলের সিদ্ধান্ত অনেক দূরে, কারণ হেগেল বিজ্ঞানকে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল স্বীকার করেন, বৌদ্ধ যোগাচারীরাও হেগেলের সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন। স্বয়ং বিজ্ঞান (চিত্ত, ভাব) বিকার অবস্থায় থাকলে তাদের কোনো আপত্তি নেই, এবং এজন্য বৌদ্ধরা জগৎকে বিজ্ঞানেরই পরিণাম স্বরূপ মনে করেন। তাঁদের মায়াবাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ বিনাশ এবং বিধ্বংসের অংকুরকে কারণ বলে স্বীকার করে না, বরং যে বস্তুর বিনাশ বা বিধ্বংস হলো, সেগুলিই 'অন্যথাসিদ্ধি-শূন্য কার্যাব্যবহিত-পূর্বক্ষণবর্তী' হওয়ার কারণেই কারণ। বিনাশ অভাব হওয়ার কারণ, তার জন্য অন্য কোনো কারণের পেছনে ছোটার প্রয়োজন নেই। সমস্ত বস্তুই তার মৃত্যু পরওয়ানা সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। অতএব তার বিনাশের জন্য কোনো কারণের আবশ্যকতা নেই। বস্তুত যাকে আমরা আগুনে পুড়ে কাঠ বিনষ্ট হচ্ছে বলি এটা সঠিক নয়। কাঠ আগুনে পুড়ে কাঠকয়লা অথবা ছাই উৎপন্ন করছে, যাকে আমরা ভাব পদার্থ বলতে পারি। মার্কস হেগেলকে বুঝতে পারেননি, কিন্তু করপাত্রী মহারাজ বুঝে ফেলেছেন, একথা বলার অর্থ নিজের ঢাক নিজে পেটানো।

মায়াবাদীদের আর একটি প্রলাপোক্তি : 'বেদান্তকদের ব্রহ্ম, সাংখ্যর প্রকৃতি অনন্ত প্রপঞ্চের ভাণ্ডার। তার মধ্যে শক্তি রূপে সমস্ত বস্তুই নিহিত আছে।'

দু'জনের প্রকৃতি আর ব্রহ্ম মোটেই এক বস্তু নয়। তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বর্তমান। ব্রহ্ম নিত্য বোধ রূপ, তার মধ্যে কখনো কোনোও বিকার হয় না, সেজন্য জগতের বস্তু সমূহের মধ্যে শক্তি (সামর্থ) রূপে অবস্থান করা সম্ভবই নয়। ব্রহ্ম বস্তুর মধ্যেও নেই কারণ ভ্রম বোধ স্বরূপ বস্তুতে অসম্ভব ব্যাপার, তাছাড়া ভ্রমের জন্য দ্বৈতের আবশ্যক। সাংখ্যর প্রকৃতির মধ্যে অবশ্য কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে, কারণ তা পরিবর্তনশীল। তাদের ত্রুটি এটাই যে তারা নিত্য চেতন পুরুষকে স্বীকার করে, যে নিষ্ক্রিয় হবার কারণেই কারণ হতে অসমর্থ। কারণের মধ্যে কার্য সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকে, তাদের এই সৎকার্যবাদ তত্ত্বও ভ্রান্ত। ধর্মকীর্তি সঠিকভাবেই বলেছেন :

'অদৃষ্টপূর্বমস্তীতি তৃণাগ্রে, কারিণাং শতম্।'

অর্থাৎ—তৃণের ডগায় অদৃশ্য শতহস্তীর সমান কারণের মধ্যে কার্যের সত্তা নিহিত। অবশ্য একথা ঠিক যে কারণের মধ্যে কার্য উৎপাদনী ক্ষমতা (শক্তি) বর্তমান। এ তত্ত্ব মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য।

করপাত্রী মহারাজের বেদান্ত প্রমাণের সমস্ত উপকরণগুলিকেই মিথ্যা মায়া বলে ঘোষণা করার ফলেই কোনো বিষয়ের স্থাপনা করতে অপারগ। তবুও কিন্তু শ্রী করপাত্রী বলছেন : 'অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক যদিও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত বস্তুকেই পরমার্থিক বাধা মনে করে তথাপি স্বপক্ষ-সাধন, পরপক্ষ-বাধনের জন্য ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রমেয় ইত্যাদি সমস্ত অবস্থাকেই স্বীকার করেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে আপন মত সমর্থন এবং পরমত খণ্ডন ঠিক সেই বস্তু যার সম্বন্ধে হাল্কা চালে ধর্মকীর্তি বলেছেন : ধরা যাক কোনো ব্যভিচারিণী স্ত্রী ব্যভিচারের সময় ধরা পড়ল। তাকে অনুযোগ করায় সে বলতে লাগল, দেখো আমার মুখপোড়া স্বামীর রকম সকম, সে আমার মতো সাধ্বীর কথায় বিশ্বাস না করে নিজের দুটো চোখকেই শুধু বিশ্বাস করছে।

এর পর করপাত্রী মহারাজ বলছেন : 'চিত্তের একাগ্রতারূপী যোগ থেকে উদ্ভূত সামর্থযুক্ত পরমেশ্বরীয় প্রজ্ঞার সাহায্যে তথা অপৌরুষেয় আগম দ্বারা আত্মা-পরমাত্মা সম্পর্কে দৃঢ় নির্ণয় করা সম্ভব হয়।'

এটা অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে কালো বেড়াল খুঁজে বেড়াবার মতো ব্যাপার। তবে আধুনিক বিজ্ঞান মহারাজের ঐশ্বরীক প্রজ্ঞার কাছে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বন্ধক রাখতে রাজি নয়, রাজি নয় তথাকথিত অপৌরুষেয় বেদের কাছেও। বেদ পৌরুষেয় এবং খৃষ্টপূর্ব একাদশ-দ্বাদশ শতকের আর্যদের ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা জানবার এক অমূল্য সম্পদ, একথা কেউ অস্বীকার করে না। অপৌরুষেয় দাবি করলে তার এই স্বীকৃতি আর থাকে না।

উপনিষদের বহু জায়গাতে অদ্বৈতের ভ্রম হয়; বস্তুত আত্মা তথা ব্রহ্মের অদ্বৈত থেকে পার্থক্য এটুকু যে এরা জগতে বস্তু সমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। এই ভাব বেদান্ত সূত্রের মধ্যেও দেখা যায়, সেজন্যই মুক্ত হলেই আত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয় না, যদিও ভোগের ক্ষেত্রে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সমান। 'ভোগমাত্র সাম্য লিংগাৎ।' সেখানে জগৎকে শরীর আর ব্রহ্মকে শরীরী কিংবা শারীরিক রূপে মানা হয়েছে। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়ও এ রকম : 'য়াপ্সু তিষ্ঠন্…অন্তরোয়ময়তি।'

এ বিষয়ে রামানুজের মত উপনিষদের বেশি অনুকূল।

ব্রহ্মের অতিরিক্ত ঈশ্বর; প্রকৃতি ইত্যাদিকে অস্বীকার করা মায়াবাদীদের একথা বলাও নিরর্থক : সমস্ত ঘটনার মূল ঈশ্বর চেতনাধিষ্ঠিত প্রকৃতি।… প্রকৃতি ক্ষণ পরিণামশীল তথা গতিশীল।'

যা স্বত গতিশীল, তার মধ্যে গতি সৃষ্টির জন্য অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা নেই, আর গতিহীন ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর চেতনার মধ্যে গতি সৃষ্টির শক্তি কোথা থেকে পাবে? বস্তুত যে ব্রহ্মকে বাণী এবং মনের সাহায্যে জানা যায় না, ইন্দ্রিয় যেখানে পৌঁছতে অক্ষম; সে রকম এক অদৃশ্য বস্তুর ক্রিয়া থেকে অনুমানের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। এ রকম তত্ত্ব শ্রদ্ধা দিয়ে মানা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণ প্রমাণ দিয়ে একে কখনোই প্রমাণ্য করে তোলা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিদ্যা, অজ্ঞান ইত্যাদি অভাব রূপ। অভাব থেকে ভাব সৃষ্টি হয় না। একথা করপাত্রী মহারাজও তাঁর গ্রন্থে বার কয়েক স্বীকারও করেছেন। যখন জগতের অস্তিত্ব নেই তখন কিভাবে বলা যেতে পারে : 'ব্রহ্মের মধ্যে অবিদ্যার আবরণ প্রমাণ সিদ্ধ অতএব তা একই সম্বিত (বিজ্ঞান) এবং অনাদি।'

'অবিদ্যা বিশিষ্ট আত্মাই স্মর্তা।'

আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনো পদার্থই নেই। যেহেতু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় অতএব তার দ্বারা স্মরণও সম্ভব নয় ; কারণ স্মৃতি এক মানসিক প্রক্রিয়া। ব্রহ্মের অবিদ্যা অভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বোধরূপ হওয়ার কারণেই অসম্ভব। প্রকাশ যদি অন্ধকারে ঢাকা থাকে তাহলে কে তাকে প্রকাশ বলে মানবে। আসলে ভ্রম, মায়া, অবিদ্যার সাহায্যে মায়াবাদীরা তাদের কাজ হাসিল করতে চায়।

'বেদান্ত মতানুসারে সর্বগত চিদাত্মাকে আবৃত্ত করে স্থিত ভাবারূপী অবিদ্যাই সম্পূর্ণ জগতের আকারে স্থিত থাকে।'

যখন সর্বজগৎই অস্তিত্বহীন তখন চিদাত্মা কিংবা ব্রহ্ম সর্বগত হবে কি-ভাবে ? অবিদ্যা যদি ভাব রূপ হয়, তাহলে ব্রহ্ম ছাড়া আর একটি তত্ত্বও সামনে এসে উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে 'ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সবই মিথ্যা' অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। যেহেতু বেদান্ত শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের বস্তু, তাকে তর্ক-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। অতএব একথা বলাও তাহলে ভুল হবে : 'অখণ্ড বোধস্বরূপ ব্রহ্মই অহং বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তাভিমিক্ত হয়, ইদংবৃত্তি যুক্ত হয়ে প্রপঞ্চাকার (মায়াময়) প্রতীত হয়, এবং সেই আন্ত-বাহ্য সমস্ত বিষয়কে সাক্ষী রূপে প্রকাশিত করে।'

'অদ্বৈত বেদান্ত দৃষ্টিতে পরমেশ্বর সর্বপ্রপঞ্চের উপাদানকারণ ; অতএব তিনি সর্বশক্তিমান।'

অদ্বৈত তত্ত্বের সঠিক হবার সম্ভাবনা কিছুদূর পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ তাকে পরিবর্তনশীল স্বীকার করা হতো। কিন্তু শংকরের বেদান্ত একে অস্বীকার করে।

'যার মধ্যে বাস্তবিক বিভাজন (বিকার) হয়ে থাকে, তা কখনোই ব্রহ্ম নয়।'

অধ্যাস (ভ্রম) মায়া

অদ্বৈতের নিষ্ক্রিয় নিত্য ব্রহ্ম জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে। জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা ভিন্ন কোনো প্রমাণ নেই, অতএব এর দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না। এ বিষয়ে মায়াবাদীদের বক্তব্য : 'অনির্বচনীয় মায়ার অধ্যাস (ভ্রম) থেকেই তার মধ্যে অনেক ধরনের ভ্রমারোপহ হয়ে থাকে।...অদ্বৈতবাদী শংকর গৌড়পাদের মতানুসারে প্রধানতন্ত্রী মতকে স্বীকার করেছেন।'

মায়া অর্থ ভ্রম, অধ্যাস এবং অধ্যারোপের অর্থও তাই। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবার মতো, জগতের কারণে তার মধ্যে কোনো বিভাজনের কল্পনাও ব্যর্থ। মায়াকে অনির্বচনীয় —যার সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না —ইত্যাদি বললেও তার প্রামাণিকতা প্রমাণিত হয় না। বিজ্ঞানবাদের সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই যে জ্ঞান গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ আর হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদ উভয়েই এই তত্ত্বকে স্বীকার করে। গৌড়পাদও এর মহত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর গ্রন্থ আগম শাস্ত্রে বিজ্ঞানকে বনৌঠি বা স্থিরচক্রের গতি বা স্পন্দনশীলতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর শংকর অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার জন্য নিজের নাকই কেটে ফেলেছেন। বিজ্ঞানবাদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশকে তিনি বাতিল করে দিলেন। প্রস্থানত্রয়ী অর্থাৎ উপনিষদ, বেদান্তসূত্র আর গীতার ভাষ্য দিয়ে শংকর তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই প্রস্থানত্রয়ীও মায়াবাদ, অধ্যাসবাদ (ভ্রান্তিবাদ) রজ্জু-সর্পভ্রমবাদকে সমর্থন করে না।

করপাত্রী মহারাজ যখন স্বয়ং চোখ বুজে অন্য বহুচক্ষু ব্যক্তির হাত ধরেছেন তখন 'অন্ধে নৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' —উক্তিটি চরিতার্থ হওয়া উচিত।

'আত্মা নিত্য অখণ্ড বোধস্বরূপ। তার মধ্যে অনাত্মার অধ্যাস বা ভ্রম এবং তজ্জনিত ভ্রমাত্মক বন্ধন হয়ে থাকে।'

আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। আত্মা অখণ্ড অর্থাৎ তাকে বিভক্ত করা যায় না। আত্মা বোধরূপী অর্থাৎ তার মধ্যে তিন কালের (ভুত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) অজ্ঞান, অবিদ্যা অথবা মায়া টিঁকতে পারে না। অধ্যাস ভ্রমেরই আরেক নাম। কিন্তু বোধরূপ আত্মার মধ্যে অনাত্মার অধ্যাস কিভাবে সম্ভব? আর সেই অধ্যাসের কারণে ভ্রমরূপী বন্ধনই বা কিভাবে হতে পারে?

তবুও মহারাজ বলে চলেছেন: 'যেমন রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয় তেমনই চৈতন্যের মধ্যে প্রপঞ্চের অধ্যাস। অতএব অধিষ্ঠান চৈতন্যের মধ্যে প্রপঞ্চ অধ্যস্ত আছে। সেই চৈতন্য থেকেই প্রপঞ্চের প্রকাশ হয়।…বেদান্ত মতে আবরণের বিনাশই মোক্ষ।'

চৈতন্য বোধরূপে বর্তমান, তার মধ্যে প্রপঞ্চ কিংবা জগতের ভ্রম হওয়া কিভাবে সম্ভব? ভ্রমের অধিষ্ঠান যদি চৈতন্য রূপ হয় তাহলে তো তা ভালো বোধরূপ? প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ অধ্যস্ত নয় বরং তা বাস্তবিক। যদি অধ্যাস বা ভ্রম কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা আছে প্রপঞ্চের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে। বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীক মনে করা প্রপঞ্চের (জগৎ) কোনো চৈতন্য থেকে প্রকাশের আবশ্যকতা নেই। যদি নিত্য বোধরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবরণ সম্ভব হয়, তাহলে এই আবরণের না হবে কখনও বিনাশ, আর না এর থেকে কেউ মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগৎকে মায়া এবং তিন কালেই অস্তিত্বহীন স্বীকার করে গৌড়পাদ বলেছেন : 'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেপি তত্তথা।'

অর্থাৎ —যা না ছিল আদিতে, না অন্তে থাকবে, তা বর্তমানেও সে রকমই অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।

জগৎ ক্ষণ পরিণামী, এর পরিণাম তত্ত্ব 'সন্ধ্যাপুত্র' তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও তা স্থান, কাল, সম্বন্ধ, ধর্ম (গুণ) যুক্ত স্থিতি রাখতে সক্ষম, সেজন্য তার স্থান, কাল, সম্বন্ধ, ধর্মের থেকে অভাব সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মহারাজ নিজেই নির্দেশ দেন : 'যস্য যদ্দেশাবচ্ছিন্নযৎকালাবচ্ছিন্নযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নযৎধর্মাবচ্ছিন্নযদধিকরণতা যত্র, তত্র তস্য তদ্দেশাবচ্ছিন্নতৎকালাবচ্ছিন্নতৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নতদ্ধর্মাবচ্ছিন্নতদত্যন্তাভাবো ন সম্ভবতি।'

অর্থাৎ —যার যে দেশ-কাল-সম্বন্ধ-ও-ধর্মবিচ্ছেদে যে অধিকারণতা যেখানে, সেখানে সেই দেশ-কাল-সম্বন্ধ-ও-ধর্মবিচ্ছেদে তার অত্যন্তাভাব থাকতে পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

বৌদ্ধদর্শন, মার্কসীয় দর্শন

বৌদ্ধদর্শনকে প্রাথমিকভাবে মার্কসীয় দর্শন জানার সিঁড়ির প্রথম ধাপ বলা যায়। যেমন, পশ্চিমে এর জন্য রয়েছে হেগেলীয় দর্শন। হেগেল বিজ্ঞান-যুগে জন্মেছিলেন, আর যোগাচার দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়, যখন থেকে আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্তিত্বে আসতে লেগেছে চোদ্দশো বছর। করপাত্রী মহারাজ বৌদ্ধদর্শনের নাম শুনেই তাকে খণ্ডন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর হয়ত জানা নেই যে মায়াবাদ বা শংকরমত বলে যা প্রচলিত তা শংকর নিয়েছিলেন গৌড়পাদের কাছ থেকে, আবার গৌড়পাদ তা বৌদ্ধদর্শন থেকেই নিয়েছিলেন। বৌদ্ধদর্শনে আত্মার কোনো স্থান নেই। বস্তুত উপনিষদের আত্মার দোহাই দিয়ে যে অজ্ঞানতা দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করে বুদ্ধ অনাত্মবাদের ঘোষণা করেন: 'সব্ব অনিচ্চং, সব্বং দুঃখং, সব্বং অনত্তা' অর্থাৎ —সবই অনিত্য, সব দুঃখ এবং সবই অনাত্মা। কিন্তু করপাত্রী মহারাজ বলছেন: 'বৌদ্ধগণ হতে পারে বৈদিক ধর্মের বিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আত্মার ধারণা আছে।'

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে মহারাজের এরকম অন্ধ হয়ে যাওয়া সঠিক নয় যে, বিরুদ্ধ পক্ষের মুখে নিজের মনোমতো কথা বসিয়ে তাকে দিয়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করাতে হয়।

AMARBOI.COM

ক্ষণিকবাদ

অনিত্যবাদ অথবা ক্ষণিকবাদ বৌদ্ধদর্শনের মূলভিত্তি সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন:

'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ
সন্তশ্চ ভাবা ইমে।' (জ্ঞানশ্রী মিত্র—ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ)

অর্থাৎ —যা সদ্‌বস্তু তা মেঘের ন্যায় ক্ষণিক। জগতের সমস্ত পদার্থ সৎ (ভাব) সেজন্যই ক্ষণিক।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে কার্য ও কারণের সদৃশতার জন্য একতার ভ্রান্তি হয়। এই মুহূর্তের দৃশ্যমান দীপশিখা, আগের মুহূর্তের দীপশিখারই অনুরূপ, সেজন্য আমরা একই দীপশিখা বলে থাকি।

সত্ অর্থাৎ বাস্তবিক পদার্থ বস্তুত কি? সে সম্পর্কে বৌদ্ধরা বলছেন:

'অর্থ ক্রিয়া সমর্থ তৎ তদত্র পরমার্থ সৎ।'

(ধর্মকীর্তি—প্রমাণবার্তিক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ —যে বস্তু অর্থক্রিয়া—বাস্তবিক ক্রিয়া—সম্পাদনে সমর্থ, তাই পরমার্থ সত্। স্বপ্নের লাড্ডু অর্থক্রিয়া—ক্ষুধা নিবৃত্তিতে—সমর্থ নয়, সে জন্যই তা সত্ নয়। জাগ্রতাবস্থার লাড্ডু—অর্থক্রিয়ায় সমর্থ, সে কারণেই তা পরমার্থ সত্। অর্থক্রিয়ায় সমর্থ হওয়ার অর্থ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হওয়া। পরমার্থ সত্-এর (বাস্তবিক পদার্থের) এই লক্ষণগুলিকে বর্তমানকালের বিজ্ঞানও স্বীকার করে। কিন্তু মায়াবাদীদের মায়া ছড়িয়ে লাড্ডু খেতে হবে।

সৎকার্যবাদ ভ্রান্ত

সাংখ্য শাস্ত্রীয়গণ সৎকার্যবাদকে মানেন, যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে এবং যার উদাহরণ করপাত্রী মহারাজ সব জায়গাতেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনিও এটা স্বীকার করেছেন : 'সাংখ্যবাদী সৎকার্যবাদী হয়েও অচেতন প্রকৃতিকেই কারণ বলে থাকেন, কিন্তু বৈদান্তিকগণ চেতন ব্রহ্মকে কারণ মনে করেন। যা সৃষ্টির আগে যে রূপে, যে অবস্থায় ছিল, তা থেকেই উৎপন্ন হয়। ...অতএব তা সৃষ্টির আগের কার্য-কারণরূপেই থেকে যায়। সৃষ্টির পরেও কার্য-কারণের সঙ্গে অভিন্ন থাকে।'

কারণের কার্য উৎপাদনের ক্ষমতাকে তার কার্যরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক, একথা আগেই বলা হয়েছে। বটবৃক্ষের বীজের মধ্যেই বিশাল বটবৃক্ষের অবস্থান একথা বলা সেরকমই ব্যাপার যেমন তৃণের ডগায় অদৃশ্য শতহস্তীর উপস্থিতিকে মানা। সেজন্য একথা বলা ভুল যে : 'সৃষ্টির আগে কার্যও সৎ অবস্থায় থাকে।'

বৌদ্ধরা বিনাশ (অভাব) কারণবাদ স্বীকার করে না, বস্তুত যা আছে ত সবই বিনাশশীল, এই তত্ত্ব স্বীকার করে। সদ্ বস্তুই (বাস্তবিক বস্তু) কারণ হতে পারে অভাব নয়। বেদান্তের 'এক' কারণবাদকে বৌদ্ধরা স্বীকার করে না বরং কারণ সামগ্রী—বহু কারণের একত্রিত হওয়াকে তারা কার্য উৎপত্তির কারণ মনে করেন। এই বিশ্লেষণ মার্কসবাদের 'পরিমাণের দ্বারা গুণগত পরিবর্তন' সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি। এই জন্যই কারণ কার্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর যদিও সাদৃশ্য থাকার জন্য উভয়কে একরকমের মনে হয়।

বৌদ্ধদর্শনে খুবই স্বল্প জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে করপাত্রী মহারাজ আবার বলছেন : 'বৌদ্ধগণ...চার আর্য সত্যকে স্বীকার করে। তাদের ঈশ্বর সুগত এবং জগৎ ক্ষণিক।'

যেভাবে এর আগে করপাত্রী মহারাজ বেচারা বৌদ্ধদের ঘাড়ে আত্মাকে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এবার ওই একইভাবে ঈশ্বরকেও গছাতে চাইছেন। এর আগেই বলা হয়েছে যে বৌদ্ধদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ধর্মকীর্তি ঈশ্বর বিশ্বাসকে বিকৃত জ্ঞান এবং জড়তার পাঁচটি লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একথা সত্য, যে বৌদ্ধগণ দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের বিনাশ এবং দুঃখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাশী পথ এই চারটি সত্যকে মেনে থাকেন। এই চারটি আর্য সত্যকে মার্কসবাদীদের স্বীকার করতেও কোনো বাধা নেই যদি তাকে এমনভাবে বিশ্লেষিত করা যায়—জগতে দুঃখ আছে, তার কারণ শোষণ, শোষণের অবসান করা, সেজন্য সাম্যবাদী পথ অনুসরণ করা। এই দুঃখ বিনাশের পথ সাম্যবাদ। বুদ্ধ এবং মার্কস উভয়েই বিশ্বকে ক্ষণিক (সদা পরিবর্তনশীল) মেনেছেন।

বিজ্ঞানবাদ

বৌদ্ধদর্শন চার ভাগে বিভক্ত। যোগাচার দর্শন তার মধ্যে একটি যা সংসারের মূল কারণকে বিজ্ঞান আখ্যা দেয়। হেগেলও তাঁর মতবাদের মধ্যে একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অসঙ্গ যোগাচারের সংস্থাপক ছিলেন। পেশোয়ারের পাঠান বংশে অসঙ্গের জন্ম। খৃষ্টপূর্ব চার শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁর সময়কাল। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি অসঙ্গেরও আগে মৈত্রেয়কেই যোগাচারের সংস্থাপক বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন, যেমন শংকরের বৈদান্তিক মতকে শংকরের আগেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গৌড়পাদ। প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে রূপ (বস্তুবাদী তত্ত্ব) এবং বিজ্ঞান (ভাববাদী তত্ত্ব) উভয়ই স্বীকৃত ছিল। উভয়ই ক্ষণিক ছিল। মনে হয় মৈত্রেয় কিংবা অসঙ্গ, কেউ কোনোভাবে গ্রীক দার্শনিক প্লাতোনের বিজ্ঞানবাদী তত্ত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। অসঙ্গের জন্মভূমি গান্ধার দেশ সুদীর্ঘকাল গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ওখানেকার গ্রীক-গান্ধার মিশ্র শিল্পকলার মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার মূলে যাই থাকুক না কেন, অসঙ্গ প্লাতোনের অদ্বৈত বিজ্ঞানবাদকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের মূল আধার ক্ষণিকবাদকে যুক্ত করেন। এভাবেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ অথবা পরিবর্তনশীল ভাববাদের উদ্ভব হয়। আবার এই তত্ত্বকে উত্তরাধিকার সূত্রে শংকর গৌড়পাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং একে অস্বীকার করেছিলেন।

বিজ্ঞানকে বৌদ্ধরা কোনো ব্রহ্ম কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার বিরোধী। এরা একথাই বলেছেন যে, স্থূল জগৎ যে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব থেকে বিকশিত হয়েছে, তার মধ্যে বস্তুর ভূমিকা দেখা যায় না। এই বিজ্ঞান এক অকূল অপার সমুদ্রের মতো, যা সতত চঞ্চল এবং পরিণামশীল। যেভাবে সমুদ্রে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে তরঙ্গে রূপান্তরিত হতে থাকে, সেভাবেই বিজ্ঞান-সমুদ্র থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা জগতের বিজ্ঞানের মধ্যে অধ্যাস (ভ্রম) কিংবা অধ্যারোপ (ভ্রমারোপ) স্বীকার করেন না, এক কথায় তাঁরা জগৎকে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বলে মানেন না। তাঁদের তো আর এ আশাংকা নেই যে বিজ্ঞান যদি নির্বিকার না থাকে, তাহলে তা ব্রহ্ম কিংবা আত্মা হতে পারবে না। বৌদ্ধদের ব্রহ্ম কিংবা আত্মার সঙ্গে কোনো দেনা পাওনা নেই কারণ তাঁরা নিরীশ্বরবাদী এবং অনাত্মাবাদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধদর্শন না বুঝে করপাত্রী মহারাজ আক্ষেপ করে বলছেন : 'বৌদ্ধরা ক্ষণিক জ্ঞানকেই আত্মা বলে থাকে।...অনুভবিতা যদি ক্ষণিক জ্ঞান হয়, তাহলে স্মৃতি কিভাবে সম্পন্ন হবে? যদি কোনো স্থায়ী আত্মা থাকে, তবে জ্ঞান থেকে সংস্কার উৎপন্ন হয়ে তা স্মৃতিতে পরিবর্তিত হতে পারে।'

বৌদ্ধরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এ তথ্য আগেই দেওয়া হয়েছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানকে তারা অবশ্যই মানে। তাদের বক্তব্য যে অনুভবিতা ক্ষণিক নয় বরং কূটস্থ নিত্য, অতএব তার ওপরে সংস্কার কার্যকর হতে পারে না। সংস্কারের জন্য দ্রব পদার্থের প্রয়োজন। কূটস্থ নিত্য তো নির্লিপ্ত; ব্রহ্ম কিংবা আত্মাকে বৈদান্তিকেরাও নির্লিপ্ত মনে করে। তাহলে তার মধ্যে সংস্কার কিভাবে লাগতে পারে? তাহলে এ ধরনের আত্মা না হতে পারে স্মৃতির সাধন, না হতে পারে পূর্ব কর্মের সংস্কার।

বৌদ্ধগণ জগতের মূল উপাদান তত্ত্বকেই বিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করে। সমস্ত জ্ঞান সমূহকে তারা বলে আলয় বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান সমস্ত কিছুর আলয়। বিজ্ঞানের তরঙ্গ অর্থাৎ বিজ্ঞানের কার্যকে তারা বলে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। করপাত্রী মহারাজের যেহেতু যোগাচার দর্শনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই, সে জন্যই তিনি আলয় বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যকে বুঝতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি আক্ষেপ করে বলছেন : 'আলয় বিজ্ঞানও ক্ষণিক, অতএব প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের মতো সেও বাসনাধিকরণ হতে পারে না। কোনো নিত্য কূটস্থ সর্বার্থদ্রষ্টার অনুপস্থিতে দেশ কাল নিমিত্তাপেক্ষ বাসনাধীন স্মৃতি প্রতি সন্ধানাদি ব্যবহার সম্ভব নয়।'

অনাবশ্যক শব্দের বাগাড়ম্বর করে সোজা কথাকে জটিল করে বলবার একটাই অভিপ্রায় তাঁর থাকতে পারে যে নিত্য আত্মাকে অস্বীকার করলে অনুভবকার এবং স্মৃতি রক্ষণকারীর মধ্যে কোনো মিল থাকবে না। এবং তার ফলে একজনের অনুভব অন্য আর একজন কিভাবে স্মরণ করতে পারে? আলয় বিজ্ঞানকে এখানে অনাবশ্যকভাবে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আলয় বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞান সমষ্টি। প্রবৃত্তি বিজ্ঞান কূটস্থ নিত্য না হওয়ার কারণে সংস্কারের বাহক হতে পারে। এ বিষয়ে চলচ্চিত্রকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদও হেগেলের বিজ্ঞানবাদের মতো পা ওপরে মাথা নিচে শীর্ষাসন করে আছে। মার্কস তার তত্ত্বের সাহায্যে হেগেলকে ওই অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন, এবং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদও সেই মাধ্যমেই মুক্তি পেয়েছে। মূল তত্ত্ব বিজ্ঞান নয় বস্তুবাদ। আর তা থেকেই বিচিত্র রঙের মতো বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে আর পৃথিবীর সমস্ত বস্তুরও উৎপত্তি ওখান থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসীয় দর্শন

মার্কসবাদের বিরোধিতা করাই করপাত্রী মহারাজের গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিক-বণিকদের শোষণের স্বার্থকে সমর্থন করা, তাকে রক্ষা করা। মার্কসীয় দর্শনকে খন্ডন করে শ্রীমহারাজ মায়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তবে তাঁরই কথায়, 'মার্কস প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকেই বাস্তবিক জ্ঞান স্বীকার করেন।'

মার্কস কেন, ধর্মকীর্তিও এই তত্ত্ব স্বীকার করে 'পরমার্থ সত্‌-এর অর্থ-ক্রিয়ায় সমর্থ হওয়ার' কথা বলে ছিলেন।

আপন অজ্ঞতা এবং কুটিলতাকে সরল নির্দোষ সাজিয়ে পেশ করে মহারাজ বলছেন: 'অনবস্থিত তর্কের ভিত্তিতে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়।'

মার্কস তর্কের দ্বারা সত্য স্থাপনে বিশ্বাস করেন না, বরং লক্ষ লক্ষ প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞতায় সম্মুখ প্রামাণ্য বস্তুকেই সদ্‌ অর্থাৎ বাস্তবিক বলে মানেন। তর্কের প্রয়োজনীয়তা করপাত্রী মহারাজের থাকতে পারে, কারণ তাঁর অভিপ্রায় সদ্‌ এর স্থাপনা নয়। তাঁর তর্ক অনবস্থিত—কখনো এর পক্ষে আবার কখনো এর বিপক্ষে। তাছাড়া মায়াবাদীরা কখনোই তর্কের জন্য অনবস্থিততাকে স্বীকার করে না। উদাহরণ স্বরূপ: 'সর্বাবাধক তর্ক' অথবা প্রমাণান্তর সংবাদী-তর্ক' অপ্রতিষ্ঠিত হয় না।'

তর্কের অপ্রতিষ্ঠার দোহাই এর আগেও মহারাজ বার কয়েক দিয়েছেন কিন্তু তাঁর বক্তব্যের অপ্রতিষ্ঠাতে তাঁর কোনো শংকা নেই। যখন তিনি সত্যকে খন্ডন করতে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন কার্যসিদ্ধির জন্য মিথ্যাকে আশ্রয় করতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। সেজন্য যখন আর কোনো উপায় চলছে না, তখন মার্কস-বাদকে মসিলিপ্ত করার চেষ্টায় তিনি বলছেন: 'মার্কসবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন্য রাশিয়াতে বৈজ্ঞানিকদের ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।'

এরকম ফাঁসি দিয়ে শাস্তির সন্ধান তো ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, মানুষের প্রাণ সম্পত্তি ধ্বংস করে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের কাউকে কাউকে এরকম সাজা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু, এরকম শাস্তি সকল রাষ্ট্রই দিয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে যাতে ভুল করে বাড়াবাড়ি না হয় সেদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এখন আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন, এবং অতীতের কিছু ভুল ভ্রান্তিকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে, তাকেও দূর করেছেন। যদি বৈজ্ঞানিকদের ওরকম শাস্তি দেওয়া হতো, তাহলে রাশিয়াতে বিজ্ঞানের এহেন প্রগতি সম্ভব হতো না, যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। মহাশূন্যে রাশিয়ার নিক্ষিপ্ত স্পুটনিক —কৃত্রিম উপগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে মহাকাশ বিজ্ঞানে তারাই সবচেয়ে এগিয়ে, আমেরিকা এখনো তাদের থেকে কয়েক বছর পেছিয়ে রয়েছে। রাশিয়াতে বৈজ্ঞানিকদের যে সম্মান, তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বস্তুত তাদের দেবতা জ্ঞান করা হয়। তাদের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করার জন্য সরকার তৈরি থাকে। মহান্ বিজ্ঞানী পাভলভ লেনিন এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে অনেক ভালোমন্দ কথা বলেছেন। লেনিন পাভলভের কটূক্তিকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন : 'আমাদের তাঁর (পাভলভ) কাজের সঙ্গে সম্পর্ক, যে কাজ বিজ্ঞানকে আরো উন্নত করতে সক্ষম। তাঁর কথায় আমাদের অত মনোযোগ না দিলেও চলবে।'

মার্কসবাদ কোনো কাল্পনিক স্বর্গসুখের লোভ দেখিয়ে জনতাকে কোনো ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ফেলতে চায় না। তারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে ইচ্ছুক। তারা একথাই বলে যে, তোমার সামনে যে পৃথিবী বর্তমান, তাকেই স্বর্গে পরিণত করা সম্ভব। শোষক বণিকগোষ্ঠী আর তার সমর্থক করপাত্রীর দল পৃথিবীকে নরকে পরিণত করে রেখেছে। যদি পথের এই বাধা-গুলিকে দূর করা যায় তাহলে পৃথিবী থেকে দুঃখ দারিদ্র্য হটাতে বিলম্ব হবে না। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। চীন ১৯৪৯ সালে বিদেশী শাসক এবং স্বদেশী শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারতে অন্নাভাব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। মুক্তির প্রাক্কালে চীনের খাদ্য-ব্যবস্থা ভারতের থেকেও সঙ্গিন ছিল। চিয়াংকাইশেকের শাসন ব্যবস্থা এক ডলার মূল্যের চালকে পঁচিশ হাজার ডলারে পৌঁছে দিয়েছিল। অনাহারে মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সমস্ত জনতার মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। ফলে জনতা কুওমিনতাংদের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের সমর্থন করতে আরম্ভ করল। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মধ্যেই চিনের অন্নাভাব দূর হয়েছে। তারপর তো তারা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যসম্ভার অন্য দেশকে দিয়েছে, যার মধ্যে ভারতও একটি। আমাদের এখানে পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে। লগ্নীকৃত সম্পদের অর্ধেক চলে যাচ্ছে পুঁজিপতি, ঠিকাদার, আর আমলাতন্ত্রের মুনাফা আর ঘুষ হিসেবে। কোটি কোটি হাত, আর মস্তিষ্ক, ধরিত্রীগর্ভে সঞ্চিত অপরিমেয় ধনরাশি অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী আর সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ সমস্ত জায়গাতেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকার ফলেই চীন এত দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। আমরা এখনো উড়োজাহাজ, আর মোটর গাড়ীর কলকব্জা বিদেশ থেকে এনে জোড়াজুড়ির কাজ করছি, সেখানে চীন জেট বিমানের ইঞ্জিন নির্মাণেও সক্ষম।

আরো দশ বছর কাটুক, ততদিনে চীন প্রগতির সেই ধাপে পৌঁছে যাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে এখন রাশিয়া রয়েছে। চীনে বেকারী, অনাহারে মৃত্যু আর দারিদ্র্যের উচ্ছেদ হচ্ছে দ্রুত লয়ে।

করপাত্রী মহারাজের যদি বহুজনের হিতের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা থাকত, তাহলে তিনি তাঁর এই অবিবেচনাপ্রসূত গ্রন্থ, যা মিথ্যার পুঁটলি মাত্র তা লেখবার জন্য এত শ্রম ব্যয় করতেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানতাপস। অথচ সাধারণ পণ্ডিতদের মতো রাজনীতি বিষয়ে তিনি ছুমার্গী ছিলেন না। জ্ঞানচর্চা ও কৃষকসভার আন্দোলন —দুই-ই তাঁর কাছে এক 'জীবনযাত্রা'র অন্তর্গত।

পঞ্চাশের দশকে একটি রাজনীতিক দল হিন্দ ভারত গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে নেমেছিল। তার নাম রামরাজ্য পরিষদ। সব আসনেই তাদের জামানত জব্দ হয়েছিল। তখনই রামরাজ্যপন্থীরা আমাদের সংবিধানপ্রদত্ত সেক্যুলার চরিত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন।

রামরাজ্য পরিষদের তাত্ত্বিক নেতা পণ্ডিত করপাত্রী শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠী আধিপত্যের প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন —চেয়েছিলেন ফিরে আসুক দাস-যুগ। কি বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হচ্ছে ভারতের মাটিতে —অনেকেই তার তাৎপর্য বোঝেননি। উপলব্ধি করেছিলেন রাহুলজী। করপাত্রীর ভুয়ো পাণ্ডিত্যের মুখোশ খুলে দিয়ে তখনই তিনি লিখেছিলেন 'রামরাজ্য ও মার্কসবাদ'।

১৯৫৮ সালে লেখা 'রামরাজ্য ও মার্কসবাদ' আজও সমান প্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রকে তার বিকৃতি থেকে বাঁচিয়ে রাহুলজী রামরাজ্যবাদীদের সমালোচনা করেছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে।

'চিরায়ত প্রকাশন' স্বল্প মূল্যে একালের পাঠকদের কাছে রাহুলজীর চিন্তাধারা প্রচারে সংকল্পবদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~